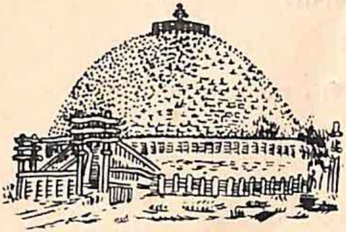
ইতিহাসের আলোচনা

সুরেন্দ্রনাথ সেন



ইতিহাসের আলেখ্য

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সেন

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট, লিমিটেড
২, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪

মূল্য টা. ১'৭৫ ন. প. (এক টাকা বারো আনা) মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্,
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

ছোটদের জন্য বার্ষিক ও মাসিক শিশু-সাথীতে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাই একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছোটদের মনে কৌতূহল জাগিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইতি—

৬ একডালিয়া প্লেস
কলিকাতা-১৯
৩রা বৈশাখ, ১৩৬৪

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

সূচীপত্র



অশোক লিপির পাঠোদ্ধার

একসময়ে শ্যামদেশে হিন্দু উপনিবেশ ছিল। এখন সেখানকার রাজা বৌদ্ধ। কিন্তু সেদেশে এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দু মন্দির আছে। মন্দিরের পুরোহিতেরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহাদের কাছে বহু হাতের লেখা সংস্কৃত পুঁথি আছে, কিন্তু এই সকল পুঁথি পড়িবার বিদ্যা তাহাদের নাই। তিন পুরুষ আগেও শ্যামদেশের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা সংস্কৃত পুঁথিগুলি অনায়াসে পড়িতে পারিত, কিন্তু এখন তাহারা সংস্কৃত ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, প্রাচীন ভারতীয় অক্ষরের সহিতও তাহাদের পরিচয় নাই।

আমাদের দেশেও এখন অনেকে খুব প্রাচীন লেখা পড়িতে পারে না। প্রিয়দর্শী অশোকের উৎকীর্ণ লিপিগুলি দেখিলে তোমরা অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করিবে না যে ওগুলি এদেশের

প্রাচীন ভাষায় প্রাচীন অক্ষরে লেখা। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনের পণ্ডিত য়ুয়ান চোয়াং যখন এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি সম্রাট অশোকের অনেক স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই স্তম্ভের গায়ে যে সকল কথা লেখা ছিল তাহা তিনি পড়িতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তখনকার ভারতীয় পণ্ডিতেরা বোধহয় অশোকের সময়ের অক্ষর পড়িতে পারিতেন না। অথচ এখন আমরা বেশ সহজেই অশোক-লিপি পড়িতে পারি।

অশোক-লিপির পাঠোদ্ধার এখন যতই সহজ বলিয়া মনে হউক, যে অক্ষর লোকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় বাহির করা যে অত্যন্ত কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কঠিন কার্য্যটি সম্ভব হইয়াছিল প্রিন্সেপ নামক একজন ইংরাজ পণ্ডিতের পরিশ্রম ও বুদ্ধিতে।

মধ্য-ভারতের সাঁচীস্তূপের কথা বোধহয় তোমরা জান। এই স্তূপটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। এখানেও অশোকের সময়ে প্রচলিত অক্ষরে লেখা কতকগুলি ছোট ছোট উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছিল। এই লিপিগুলি পরীক্ষা করিবার সময় প্রিন্সেপের মনে হইল যে, হয় এগুলিতে ব্যক্তি বিশেষের দানের কথা, না হয় ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি জানিতেন যে, ব্রহ্মদেশে বড় বড় বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছোট ছোট মন্দির রচনা করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের টাকায় এই সকল ছোট মন্দির

নির্ম্মিত হয় অনেক সময়ে মন্দিরের ভিতরে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁহাদের দানের কথা লেখা থাকে। সুতরাং প্রিন্সেপ ধরিয়া লইলেন যে, সাঁচীর লিপিগুলিতেও এইরূপ দাতার নাম ও দানের কথা আছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিপিগুলির পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরিশ্রমের পর প্রিন্সেপ দেখিলেন যে, তাঁহার অনুমান অমূলক নহে। ঐ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেবল সাঁচীর ছোট ছোট লিপি নহে অশোকের বড় বড় লিপিও পড়িতে পারা যায়।

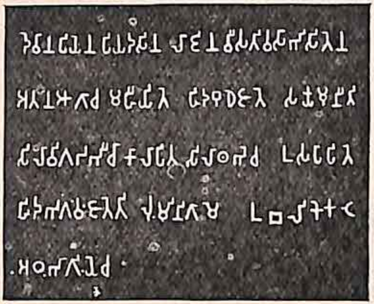
প্রিন্সেপ কিরূপে অশোক অনুশাসনের ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর চিনিয়াছিলেন এখন তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। তিনি ভাবিলেন যে, যদি সাঁচীর সংক্ষিপ্ত উৎকীর্ণ লিপিতে দানের কথাই লেখা থাকে তবে সর্ব্বশেষের কথাটি হইবে "দান" এবং শেষের অক্ষর দুইটি হইবে "দ" এবং "ন"। এই ভাবে তিনি দুইটি অক্ষরের পরিচয় পাইলেন!

শেষের কথাটি যদি "দান" হয় তবে তাহার আগে আছে দাতার নাম ও নামের শেষে সম্বন্ধসূচক "স"। এই ভাবে আর একটি অক্ষর পাওয়া গেল। তারপর এই তিনটি অক্ষরের সাহায্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হইতে সকল অক্ষরের পরিচয় বাহির করিয়া লইলেন। এ হইল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের কথা। মনে করিও না যে কাজটি খুব সহজ। কারণ অক্ষরগুলি ব্যতীত স্বরবর্ণের চিহ্ন ও যুক্তাক্ষরের পরিচয়ও কেবল অনুমানের সাহায্যে প্রিন্সেপ ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠও

সর্ব্বত্র নির্ভুল হয় নাই। এখনও অশোকলিপির সঠিক পাঠ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু প্রিন্সেপ পথ দেখাইয়া না দিলে অশোক-লিপির পাঠোদ্ধার হইতে যে আরও অনেক বিলম্ব হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

অশোকের সকল উৎকীর্ণ লিপিগুলি কিন্তু এক রকমের অক্ষরে লেখা নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মানসেরা ও শাবাজগিরির পর্ব্বতগাত্রে যে অশোক-লিপি দেখা যায় তাহা আধুনিক আরবীর মত ডানদিক হইতে বাঁয়ে লেখা। এই অক্ষরের নাম খরোষ্ঠী বা খরোষ্ট্রী। অন্য সকল উৎকীর্ণ লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। এই ব্রাহ্মী অক্ষরকে বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষরের প্রপিতামহ বলা যাইতে পারে। প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী অক্ষরের পরিচয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল অন্য উপায়ে। সীমান্ত প্রদেশে একসময়ে অনেক যবন (গ্রীক) রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মুদ্রায় গ্রীক ও খরোষ্ঠী লিপিতে তাঁহাদের নাম লেখা থাকিত। সুতরাং খরোষ্ঠী অক্ষর পড়িতে তত বেগ পাইতে হয় নাই।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহেঞ্জোদারোতে আর একপ্রকার অপরিচিত লিপিতে লেখা অনেকগুলি শীল পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এখনও কেহ পড়িতে পারে নাই। সুতরাং লেখাগুলির ভাষা যে কি তাহাও জানা যায় নাই। তোমরা যদি এই সমস্যা উদ্ধার করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও প্রিন্সেপের মত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবে।



লিপিতে এই কথাগুলি লেখা আছে—

দেবান পিয়েন পিয়দশিন লাজিন বিশতি বশাভিসিতেন
অতন আগাচ মহিয়িতে হিদ বুধে জাতে
শক্যমুনীতি শিলা বিগড়ভিচা কালাপিত
শিলা থভেচ উসপাপিতে হিদ ভগবং জাতেতি
লুম্মিনি গামে উবলিকেকতে অঠভাগিয়ে চ

ইহার অর্থ এই—

বিংশতিবর্ষে অভিষিক্ত দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা স্বয়ং আসিয়া অর্চ্চনা করিলেন। এখানে শাক্য মুনি বুদ্ধ জাত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিল্প ভিত্তি করাইলেন। এখানে ভগবান জাত হইয়াছিলেন বলিয়া লুম্বিনী গ্রামকে বলি (১) হইতে মুক্ত করাইলেন (রাজস্ব হিসাবে) অষ্টমাংশ দিবার (অধিকার দিলেন)।

(১) বলি = ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর।

এই পাঠ ও অনুবাদ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।



শ্যামের অযোধ্যা

রামের অযোধ্যার কথা তোমরা সকলেই জান, কিন্তু শ্যামের অযোধ্যার কথা শুনিয়াছ কিনা জানি না। পাটীগণিতের পাঠ্য বইতে অথবা পদ্যমালার বুধী গাইর কবিতায় যে রাম-শ্যামের নাম আছে, সে শ্যামের কথা বলিতেছি না। বাংলা দেশের পূবদিকে আসাম, আসামের ওধারে ব্রহ্ম এবং তাহারও ওপারে যে স্বাধীন শ্যামদেশ আছে, আজকালকার ভূগোলে ঠাইদেশ বা ঠ্যাইল্যাণ্ড বলিয়া যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, সুদূর প্রাচ্যের সেই শ্যামরাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা সরযূ নদীর তীরে যে অযোধ্যায় রাম রাজত্ব করিতেন সেই অযোধ্যার খবর পাই; এখনও লোকে কথায় কথায় বলে, 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।' শ্যামের অযোধ্যার সম্বন্ধেও বলা যায় 'সে

শ্যামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।' শ্যাম ঠাইদেশে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই অযোধ্যা হইতে রাজধানী ব্যাকাঙ্গে (ব্যাঙ্ককে) স্থানান্তরিত হইয়াছিল। শ্যামদেশে ঠাইদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে অনেকদিন, তাহার নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে অল্প কয়েক বৎসর হইল।

শ্যামের রাজধানীর নাম অযোধ্যা হইল কেন? কোথায় সরযূ আর কোথায় মেনম নদী? ভারতবর্ষ হইতে শ্যাম যাইতে এই রেল-ষ্টীমারের যুগেও তিন সপ্তাহের অধিক সময় লাগে। তবে সেখানকার লোকেরা আপনাদের সহরের নাম ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ নগরের নামানুসারে কেন রাখিয়াছিল? আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে সেখানেও অক্সফোর্ড আছে কেম্ব্রিজ আছে; নিউ ইয়র্কের 'নিউ' বাদ দিলে বিলাতী একটা বড় সহরের নাম বলিয়া ভুল হইতে পারে। তোমরা বলিতে পার যে, ইহার কারণ ত জলের মত পরিষ্কার। ইংরাজেরাই ত আমেরিকায় গিয়া নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এখনও ওখানকার লোকেরা ইংরেজী ভাষায় কথা বলে, ইংরেজী ভাষায় পত্র লেখে, ইংরেজী কেতাব পড়ে। তাহারা নূতন দেশে গিয়াও পূর্ব্বপুরুষের কথা ভুলিতে পারে নাই; সুতরাং পুরাতন দেশের বড় বড় সহরের নামে নূতন দেশের অনেক সহরের নামকরণ করিয়াছে। শ্যামদেশের সম্বন্ধেও এইকথা সম্পূর্ণরূপে খাটে।

এখন ওদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের

চেহারার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু শ্যামদেশের রাজা বৌদ্ধ, তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যেও অনেকেই বুদ্ধের ধর্ম্মাবলম্বী। যদি কখনও ঠাইদেশের ডাকটিকিট পাও ত দেখিবে যে ওখানকার অক্ষরগুলিও অনেকটা দেবনাগর অক্ষরের মত। রাজাদিগের নাম শুনিলে মনে হয় যে, ইঁহারা আমাদের দেশের লোকই হইবেন। কিছুদিন আগে শ্যামের রাজা ছিলেন ষষ্ঠ রাম, সুতরাং তাঁহার আগে আরও পাঁচজন রামনামধারী রাজা শ্যামদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই হিসাবে শ্যামদেশের অযোধ্যানগরকেও রামের অযোধ্যা বলা চলে। অল্পদিন আগে যে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম প্রজাধিপক—খাঁটি সংস্কৃত নাম। এই সেদিন যে রাজা আততায়ীর হাতে মারা গেলেন তাঁর নাম আনন্দ। সহরের নামের মত রাজাদের ভারতবর্ষীয় নামও আকস্মিক নহে।

বহুদিন আগে ভারতবর্ষের কতকগুলি দুঃসাহসী লোক সমুদ্র পার হইয়া সুমাত্রা, জাভা, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দ্বীপে ও দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গোপসাগর এবং ভারত সাগর দস্তুরমত জরিপ করা হইয়াছে। সমুদ্রের কোথায় কতখানি জল, কোন জায়গায় চোরা বালি, কোন জায়গায় ডুবা পাহাড়, জাহাজের কাপ্তেনরা নকসায় চক্ষু বুলাইলেই জানিতে পারেন। তার উপর জায়গায় জায়গায় বাতি-ঘর আছে, আলোর নৌকা আছে ; সুতরাং এখন দিন-রাত্রি জাহাজ চালাইতে কোন অসুবিধা বা ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু সেকালের হিন্দু নাবিকেরা যখন ভারত সাগর বাহিয়া

প্রাচ্যদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন না ছিল সমুদ্রের পথ জানা, না ছিল কম্পাস ; সূর্য্য, চন্দ্র আর বড় বড় তারা দেখিয়া দিক ঠিক করিতে হইত। যদি মেঘ হইত, কুয়াসায় চন্দ্র-তারা ঢাকা পড়িত, তবে পথ হারাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে সকল অসমসাহসী বীরপুরুষ, এই অজানা পথের সমস্ত বিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া পূর্ব্বদিকে নূতন দেশের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম আজ আমরা ভুলিয়া গেলেও তাঁহারা কলম্বাস বা ভাস্কো-ডা-গামা অপেক্ষা যে কোন অংশেই ছোট ছিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

সেকালের হিন্দু নাবিকেরা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন ঠিক বলা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ইন্দোচীন পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই তাঁহাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সিঙ্গাপুরের নাম এখন সকলের মুখে শোনা যায়, তাহা সংস্কৃত সিংহপুরের অপভ্রংশ। পেনাঙ্গের নিকট কেটা নামক একটি ছোট রাজ্য আছে। কেটা সংস্কৃত কটাহের রূপান্তর এবং পেনাঙ্গ শব্দেরও বোধ হয় পুন্নাগ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল দেশে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিলে আর সন্দেহ থাকে না যে এগুলি সেকালের হিন্দু ওস্তাদদিগের অথবা তাহাদের সাগ্রেদদিগের হাতে গড়া।

শ্যাম, ইন্দোচীন এবং যবদ্বীপের বহু প্রাচীন মন্দির ভারতীয় রীতিতে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল দেশে খাঁটি সংস্কৃত

ভাষায় লেখা অনেক উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানি উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধগুপ্ত নামক একজন নাবিক পেনাঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ যে, কৌণ্ডিন্য নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রথম পূর্ব্বাঞ্চলে যাইয়া সেখানকার রাজা হন। বলি নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে এখনও বহু হিন্দুর বাস। সুতরাং ওদেশের লোকেরা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প জানে, অযোধ্যা অথবা হস্তিনাপুরের নাম শুনিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

মালয় উপদ্বীপে এখন অনেকগুলি ছোটখাট রাজ্য আছে। এই সকল রাজ্যের মুসলমান সুলতানেরা কিন্তু আরবদেশ হইতে আসেন নাই। তাঁহারা সেই প্রাচীন হিন্দু বিজেতাদিগের বংশধর। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষে আরব বণিকদিগের প্রভাবে মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্যামদেশের রাজা বৌদ্ধ। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান আছেন। এখনও এইসকল ব্রাহ্মণেরা ওদেশের প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঘরে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এখন আর তাঁহারা সে সকল পুঁথির অক্ষরও চেনেন না, ভাষাও জানেন না। তাহা হইলেও রাজার অভিষেকের সময় বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের আগে তাঁহাদেরই ডাক পড়ে। তাঁহারাই অভিষেকে পৌরোহিত্য করেন।

এখনও তাঁহারা প্রাচীন রীতি অনুসারে পূজা-পাঠ করিবার পর বৌদ্ধ পুরোহিতেরা আসিয়া অভিষেক-অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহার অর্থ বলিবার সাধ্য তাঁহাদের নাই।

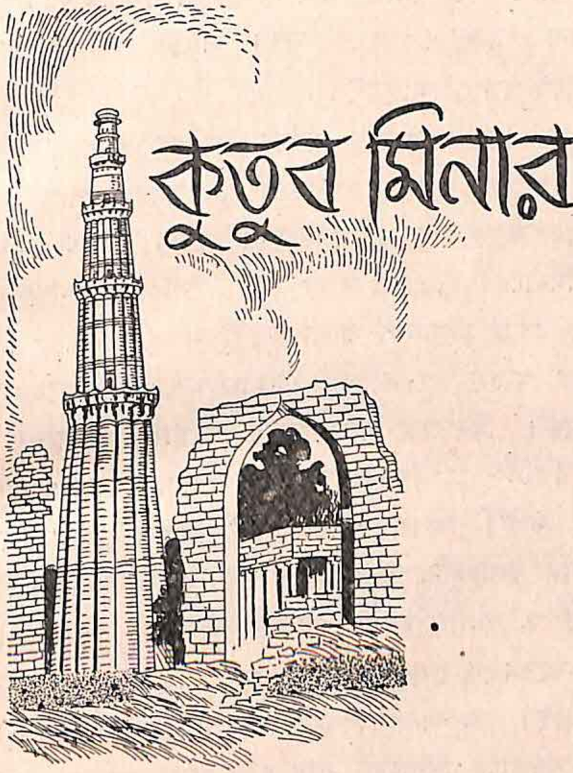
রামের অযোধ্যার খ্যাতি বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্যামের অযোধ্যার নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল সভ্য দেশের লোকেরাই জানিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশের বাণিজ্যতরী অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী নদীতে নানা দেশের বিভিন্ন পণ্য বাহিয়া লইয়া আসিত। আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের মুসলমান বণিকেরা অযোধ্যার বাজারে বিপণি সাজাইয়া বসিয়াছিলেন। একজন ফরাসী পর্য্যটক বলিয়াছেন, এমন সুন্দর নগর তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

ভারতবর্ষের হিন্দুরা রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ভক্তি করেন। শ্যামের অযোধ্যায় যে রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাকেও তাঁহার প্রজাগণ দেবতার মত সম্মান করিত। তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিতে হইত যুক্ত-করে, ভূলুণ্ঠিত-দেহে। সহসা বাদ্যধ্বনি হইত, উপরের যবনিকা সরিয়া যাইত। ভূতলশায়ী মন্ত্রী দেখিতেন, তাহার বহু উর্দ্ধে, শান্ত সমাহিত স্বমহিমায় প্রদীপ্ত রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এখন সে শ্যামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

ভারতবর্ষের বাহিরে আর কি নূতন অয্যোধ্যা, নূতন হস্তিনাপুর, নবীন ইন্দ্রপ্রস্থ হইবে না? প্রাচীন হিন্দু

সভ্যতার গরিমা কি শ্যাম ও কম্বোজের নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে—আঙ্কোর ও বরবুদুরের বিশাল মন্দিরের জীর্ণাবশেষের মধ্যে সমাহিত হইয়া থাকিবে? আর কি ভারতের নাগরিক, ভারতের পরিব্রাজক, ভারতের স্থপতি অজ্ঞাত বারিধি, দুর্গম বনানী ও পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া ভারতের বাণী বিদেশে প্রচার করিতে যাইবেন না? রামের অযোধ্যার সহিত শ্যামের অযোধ্যার সংযোগ কি চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

কুতুব মিনার



দিল্লীর কুতুব মিনারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও দিল্লী গিয়াছ তাহারা মিনারের সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে মাথা অবধি উঠিয়া থাকিবে। এত বড় ও এমন সুন্দর মিনার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। কুতুব মিনার দুই শত আটত্রিশ ফুট উঁচু, পাঁচ তলায় বিভক্ত।

নীচের তিন তলা লাল পাথরের তৈয়ারী, বাহিরের দেওয়ালের গায়ে গোল ও তিন কোণা পল তোলা। চতুর্থ ও পঞ্চম তলা শাদা পাথরে গড়া। নীচের তিন তলার মত দেওয়ালে পল তোলা নাই।

এই মিনার কাহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। মিনারের গায়ে এখানে সেখানে কতকগুলি লেখা আছে। তাহা হইতে মোটামুটি এই মিনারের ইতিহাস জানা যায়। সাধারণের বিশ্বাস যে দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা কুতুবুদ্দিন এই মিনার নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার নামেই মিনারের নাম হইয়াছে। মিনারের গায়ে অবশ্য তাঁহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনিই যে মিনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এমন কথা লেখা নাই। অপর পক্ষে দুইটি লেখায় দেখা যায় যে, সুলতান ইলতুত্‌মিসের আদেশে এই অপূর্ব্ব মিনারের নির্ম্মাণ আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়। এইজন্য এখনকার অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, সুলতান কুতুবুদ্দিনের নামে মিনারের নামকরণ হয় নাই। তখনকার বিখ্যাত সাধু কুতুবুদ্দিন বখতিয়ারের নাম অনুসারে মিনারের নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, মিনারের নীচের তলার কাজ কুতুবুদ্দিনের সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল; ইলতুত্‌মিসের আদেশে উপরের কয়েকটি তলা তৈয়ার করা হয়।

মিনারের উপর কয়েকবার বজ্রাঘাত হইয়াছিল। তাহার খবরও দেওয়ালের বিভিন্ন লেখা হইতে পাওয়া যায়। ১৩২৬

খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে সপ্তমীর দিন একবার মিনারে বাজ পড়িয়াছিল। এতদিনের পুরাতন মিনার, তাই মধ্যে মধ্যে মেরামত করা দরকার হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। স্থলতান ফিরুজ শাহ তুগলুক ও স্থলতান সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে কুতুবমিনার মেরামত করা হয়। ফিরুজ শাহ বোধ হয় হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা উপরের তুই তলা একেবারে নূতন করিয়া তৈয়ার করাইয়াছিলেন। একটি নাগরী লিপি হইতে জানা যায় যে, ছহডদেব পালের পুত্রের দৌহিত্র ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে ১৪২৬ সম্বতে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবার নির্ম্মাণকার্য্যের সূত্রপাত করেন। আর একটি নাগরী লিপিতে নানা ও সালহা নামক দারুশিল্পীর (সূত্রধরের) নাম আছে। ১৮৩২ সম্বতে চুণীলাল নামক কোন ব্যক্তি মিনারের একটি জালী দরজা লাগাইয়াছিল।

স্থতরাং কুতুবমিনার একদিকে যেমন মুসলমান রাজাদিগের কীর্ত্তি অপরদিকে তেমনই হিন্দু স্থপতি ও শিল্পীদিগেরও কীর্ত্তি।



ডাক-হরকরার ঘন্টা

যাট বৎসর আগে, আমরা যখন পাঠশালায় পড়িতাম, তখন বিকালবেলা আমাদের কান থাকিত পাঠশালার সম্মুখের পথের দিকে। পাঠশালায় ঘড়ি ছিল না, তাই ছুটির বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও ছিল না। সামনের পথ দিয়া যখন ডাক-হরকরা চিঠির থলি কাঁধে করিয়া চলিয়া যাইত তাহার একটু পরেই আমাদের ছুটি হইত। ডাক-হরকরার হাতে থাকিত ছোট একটা বল্লম। বল্লমের ফলার কাছে গোটা কয়েক ঘুঙ্গুর বা ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকিত। চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিতে থাকিত, তাই ডাক-হরকরাকে দেখিবার আগেই আমরা তাহার আসার খবর পাইতাম ঘণ্টার শব্দে। আমরা মনে করিতাম, আমাদের ছুটির সময়টা জানাইবার জন্যই বুঝি ডাক-হরকরা টুন্‌টুন্ ঝুন্ ঝুন্ করিয়া

ঘণ্টা বাজাইয়া চলে। কিন্তু আমাদের পিতামহের পিতামহরা যখন পাততাড়ি-বগলে পাঠশালায় যাইতেন, তাহারও বহু আগে এদেশের ডাক-হরকরারা রাজার ডাক পিঠে করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ছুটিয়া চলিত!

এদেশে প্রথম কখন ডাকের ব্যবস্থা হয় সঠিক বলা যায় না। তবে ছয়শ' বছর আগেও যে ঘোড়ার ও পদাতিকের ডাকের প্রচলন আমাদের দেশে ছিল, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। এখন যেমন তিন পয়সার একখানা পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখিয়া ডাক-বাক্সে ফেলিয়া দিলেই ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে খবর দেওয়া যায়, ছয়শত বৎসর আগে অবশ্য সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তখন কয়জন গৃহস্থই বা বিদেশে যাইত, আর কয়জনই বা বিদেশ হইতে চিঠিপত্র লিখিত? তখন ডাকের ব্যবস্থা হইয়াছিল রাজার গরজে। দেশের নানাস্থান হইতে রাজকর্ম্মচারীরা রাজার নিকট খবর দিয়া যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহা লইয়া যাইবার জন্যই ঘোড়ার ও পদাতিকের ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

প্রায় ছয়শত বৎসর আগে আফ্রিকার উত্তর উপকূলের মরক্কো দেশ হইতে একজন মুসলমান পণ্ডিত ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার নাম ছিল সেখ আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ, কিন্তু তিনি ইবন বতুতা নামেই সমধিক পরিচিত। ইবন বতুতা কেবল যে নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নহে। তিনি যে সব দেশ দেখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে মস্ত একখানা বইও লিখিয়া গিয়াছেন। ইবন বতুতার

২

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি এদেশের ডাকের কথাও লিখিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ডাক-হরকরার ঘণ্টার কথাও লিখিতে ভুলেন নাই।

ইবন বতুতা যখন এদেশে আসেন, তখন সুলতান তুঘলুক শাহের পুত্র পাগলা মহম্মদ দিল্লীর রাজা। তিনি ইবন বতুতাকে খুব খাতির যত্ন করিয়াছিলেন। কারণ রাজা নিজেও খুব বিদ্বান লোক ছিলেন। ইবন বতুতা লিখিয়াছেন যে, মহম্মদের রাজ্যে ঘোড়ার ডাকের আড্ডা ছিল চারি মাইল অন্তর; কিন্তু প্রত্যেক মাইলে পদাতিক ডাক-হরকরার আড্ডা ছিল তিনটা করিয়া। গ্রামের বাহিরে ডাক-হরকরাদের জন্য তিনটা করিয়া তাঁবু থাকিত। সেখানে ডাক-হরকরারা আমাদের মতই ঘণ্টার আওয়াজ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রত্যেক ডাক-হরকরার হাতে, হাত দুই লম্বা একখানা লাঠি থাকিত। আর লাঠির আগায় বাঁধা থাকিত এক গোছা ছোট ঘণ্টা। চিঠিপত্র পাইলেই হরকরা ঐ লাঠির আগায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে খুব জোরে ছুটিয়া চলিত। পরের আড্ডার কাছে আসিলেই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সেখানকার একজন হরকরা চিঠি লইয়া দৌড়াইবার জন্য তৈয়ার হইত। সুতরাং কোন আড্ডায় অযথা দেরী হইবার সম্ভাবনা ছিল না, আর প্রত্যেক হরকরাকে মাত্র এক মাইলের তিন ভাগের এক ভাগ পথ চলিতে হইত বলিয়া, তাহারা বেশ জোরেই ছুটিতে পারিত। ইবন বতুতা লিখিয়াছেন যে, ঘোড়ার ডাক অপেক্ষা পায়ের ডাকেই চিঠি

ও জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি যাইত। এমন কি, খোরাসানের ফল ভারতের বাজারে আমদানী হইত ঐ পায়ের ডাকের কল্যাণে। সময় সময় নাকি পায়ের ডাকে কয়েদী পর্য্যন্ত এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চালান হইত। একটা ডুলিতে কয়েদী চাপাইয়া কয়েকজন ডাক-হরকরা তাহাকে বহিয়া নিয়া যাইত।

এখন ত ডাক-পিয়ন তোমাদের বাড়ীতেই চিঠি পৌঁছাইয়া দিয়া যায়, কিন্তু ডাকঘর হইতে যদি নিজের নিজের চিঠি বাছিয়া বাহির করিয়া আনিতে হইত, তাহা হইলে কেমন মুস্কিল হইত বল দেখি। মহম্মদের পরবর্ত্তী রাজা ফিরুজ শাহের সময় কিন্তু দিল্লীতে একবার এই রকম একটা বিভ্রাট হইয়াছিল। ফিরুজ শাহ বাঙলাদেশ হইতে দিল্লী ফিরিবার পথে উড়িষ্যার জঙ্গলে ঢুকিয়াছিলেন। অজানা অচেনা দেশের জঙ্গলে তাঁহার লোকেরা আর পথ খুঁজিয়া পায় না। কাজেই সুলতানের কর্ম্মচারীরা ডাকের কোন ব্যবস্থাও করিতে পারে নাই। মাসের পর মাস চলিয়া গেল, দিল্লীর লোকেরা না পাইল রাজার সংবাদ, না পাইল আপন আপন আত্মীয়-স্বজনের খবর। শেষে যখন সুলতান পথের সন্ধান পাইলেন, তখন আর সকল কাজ ফেলিয়া সকলের আগে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শিবিরের সকল লোকই তাড়াতাড়ি একখানা করিয়া চিঠি লিখিল বা লেখাইল; কিন্তু চিঠি বিলি করিবার ব্যবস্থা সেকালে দিল্লীতে ছিল না। তাই রাজ-প্রতিনিধি সহরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে—রাজার শিবির

হইতে ডাক আসিয়াছে, সহরের লোকেরা যেন নিজের নিজের চিঠি ডাকের আড্ডা হইতে বাছিয়া লইয়া যায়। সেদিন চিঠির জন্য যে কি ভয়ানক কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার। হয়ত চিঠি আনিতে গিয়া কেহ কেহ জখম হইয়াই ফিরিয়াছিল। তবে সেকালেও এরকম ঘটনা বোধ হয় বেশী হয় নাই, তাই মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই ডাক-বিভ্রাটের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছিলেন।

আচ্ছা, আমরা যেমন ডাক-হরকরার ঘণ্টা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম, ইবন বতুতার আমলেও কি বাঙ্গালার পাঠশালার ছেলেরা হরকরার ঘণ্টার আওয়াজের জন্য তেমনই আগ্রহে প্রতীক্ষা করিত ?

হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া

দিল্লীর বাদশাহ্ ও স্থলতানদিগের মধ্যে অনেককেই এখন আর আমরা স্মরণ করি না। অথচ এক নিরন্ন ফকিরের দরগাহে এখনও প্রত্যহ বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। বাদশাহ্‌দিগের প্রভুত্ব তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ফকিরের প্রতিপত্তি তাঁহার তিরোধানের ছয়শত বৎসর পরেও অব্যাহত রহিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই সেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে সমানভাবে ভক্তি করে। দিল্লীর বাদশাহের রাজকর বহুদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিজামুদ্দিনের সমাধিপ্রাঙ্গণে ভক্তের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত নজরানা বোধ হয় কোন কালেই বন্ধ হইবে না। জীবিত কালে অর্থাভাবে তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছেন। রাজধানীতে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি দিল্লীর অদূরে ঘিয়াসপুর গ্রামে একখানি সামান্য

গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র কুটীর-প্রাঙ্গণ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মোগল রাজবংশের বহু নরনারী এই সাধুর সমাধির নিকট আপনাদের শেষশয্যা রচনা করিয়াছেন। শাহ্‌জাহানের আদরিণী কন্যা জাহানারা বেগমের সমাধি নিজামুদ্দিনের দরগাহে। এইখানেই বাদশাহ্‌ মহম্মদ শাহ্‌ সমাহিত হইয়াছেন। এদেশে সংসার-বিরাগী সাধুরা চিরদিনই দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের অপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

হজরত নিজামুদ্দিনের পিতামহ খাজা সৈয়দ আলি মধ্য এসিয়ার বোখারা নগর হইতে আসিয়া বর্ত্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত বদায়ুন সহরে বাস করেন। এইখানে খ্রীষ্টীয় ১২৩৮ সালে সাধু নিজামুদ্দিনের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। পরিবার প্রতিপালন করিবার অন্য লোক ছিল না। কিন্তু নিজামুদ্দিনের মাতা বিবি জুলেখা অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রতিবেশীদিগের দয়াদত্ত দানে বালক পুত্র ও বালিকা কন্যাকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অর্থাভাবে অনেকদিন তাঁহারা উপবাস করিয়াছেন, কিন্তু স্নেহময়ী মাতা কখনও পুত্রের শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইতে পারেন নাই। নিজামুদ্দিনের যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন তিনি বদায়ুনের বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য দিল্লী গমন করেন। দিল্লী তখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। এইখানে আসিয়া তিনি মওলানা কামালুদ্দিন জহিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কামালুদ্দিন জহিদ যে কেবল অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার মত স্বাধীনচিত্ত অধ্যাপক সেকালে বিরল ছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন জহিদের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে প্রধান ইমামের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নির্লোভ পণ্ডিত সম্রাটের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কামালুদ্দিনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াও নিজামুদ্দিনের মন তৃপ্ত হইল না। তিনি বাল্যাবধিই অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রগ্রন্থের খবর রাখেন, কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থে সর্ব্বদা ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং পণ্ডিতের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজামুদ্দিন সাধুসঙ্গের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন।

তখন আযোধানের সেখ ফরিদ গঞ্জ-শখর কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার তপস্যার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বিখ্যাত দিগ্‌বিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নির্ম্মম ভাবে হিন্দুস্থানের বড় বড় নগর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু শেখ ফরিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আযোধানবাসীদিগের কোন অনিষ্ট করেন নাই। নিজামুদ্দিন আযোধানে গিয়া শেখ ফরিদের শিষ্য হইলেন। এই সময় তিনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছাইয়াছিলেন। একটি মহিলা দয়া করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাপড় চোপড় কাচিয়া দিতেন। দিল্লী ফিরিবার প্রাক্কালে গুরু ফরিদ শিষ্যকে পথের খরচের জন্য একটি

স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজামুদ্দিন যখন শুনিলেন যে গুরুর পরিবারে ঐ মুদ্রাটিই শেষ সম্বল, তখন তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে মোঁহরটি ফিরাইয়া দিয়া গুরুর আশীর্ব্বাদ লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দিল্লীতে নিজামুদ্দিনের প্রথম কয়েক বৎসর ভয়ানক কষ্টে কাটিয়াছিল। তখন একটি তাম্রমুদ্রায় (জিতল) একটি তরমুজ পাওয়া যাইত, কিন্তু হজরতের গৃহে সমস্ত বৎসরে এক টুকরা তরমুজও আসিত না। রুটির দরও তখন খুব সস্তা ছিল। আধ পয়সায় এক সের রুটি বিক্রয় হইত, কিন্তু নিজামুদ্দিন কখনও কখনও একাদিক্রমে তিনদিন উপবাসী রহিয়াছেন। একবার তিনদিন উপবাসের পর একজন তাঁহাকে একবাটি খিচুড়ি দিয়াছিল। নিজামুদ্দিন বলিয়াছেন যে, সেই সামান্য খিচুড়ি সেদিন তাঁহার নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যেদিন ঘরে কিছু থাকিত না সেদিন তাঁহার মাতা বলিতেন, আজ আমরা ৺ভগবানের অতিথি। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁহারা ৺ভগবানে বিশ্বাস হারান নাই।

১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখ ফরিদ নিজামুদ্দিনকে তাঁহার দণ্ড, পরিচ্ছদ ও প্রার্থনা করিবার আসন পাঠাইয়া দিলেন। ফরিদের মৃত্যুর পর নিজামুদ্দিনই তাঁহার শিষ্যদিগের গুরুস্থানীয় হইলেন। তিনি বরাবরই সমস্ত রাত্রি উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। অনিদ্রায় তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া থাকিত, কিন্তু তাঁহার মুখে দেখা যাইত অপূর্ব্ব শান্তির জ্যোতি। এই সময় তাঁহার সাধনার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, আর্থিক

অভাবও ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গেল। কিন্তু দুর্দ্দিনে অথবা সুদিনে তিনি কখনও ধনীর দ্বারস্থ হন নাই। সুলতান জালালুদ্দিন স্বেচ্ছায় তাঁহাকে একখানি গ্রাম দিতে চাহিয়াছিলেন। সাধু নিজামুদ্দিন সে দান গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হন নাই। রাজনীতি হইতে তিনি ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিতেন। রাজার অনুগ্রহ তিনি কখনও যাচ্ঞা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় রাজপুরুষ ও রাজপুত্রেরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে ঘিয়াসপুরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সুলতান আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁ এবং সম্রাট মহম্মদ তুঘ্লক সাধু নিজামুদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত নিজামুদ্দিনের দরগাহে খিজির খাঁ একটি সুন্দর মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মসজিদ এখনও বর্ত্তমান।

সেখ নিজামুদ্দিনের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এই গল্পগুলি সত্য কিনা তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তিনি নিজে আপনার সাধুজীবনের আদর্শ দ্বারা শিষ্যদিগের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভগবৎ আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কখনও সংসারের সুখ কামনা করেন নাই। এখনও সহস্র সহস্র লোক তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাঁহার দরগাহে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে। তোমরা দিল্লী গেলে অবশ্য হজরত নিজামুদ্দিনের দরগাহ্ দেখিয়া আসিবে।



দেখা ও শোনা

দেখা ও শোনার মধ্যে অনেক পার্থক্য। নিজের চোখে কিছু দেখিলে যেমন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়, অপরের মুখে শোনা কথায় সেরূপ নির্ভর করা যায় না। অবশ্য দেখিতে যে আমাদের কখনও ভুল হয় না এমন নহে। রাত্রির আব্‌ছা অন্ধকারে কত কি আমাদের চোখে পড়ে যার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জোর করিয়া কোন কথা বলা চলে না। ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল দিয়া কোন সাবধানী জীব যখন চুপে চুপে চলিয়া যায়, তখন তাহার দেহের কতটুকুই বা চোখে পড়ে। যেটুকু দেখি তাহাতে সকল সময় কি আর বলা যায় ওটা বন-বেড়াল, না আর কিছু। মোটের উপর চোখে দেখা আর কানে শোনার মধ্যে বিস্তর তফাৎ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অনেক বিদেশী পর্য্যটক সেকালে ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া মেলা শোনা কথাই লিখিয়া

গিয়াছেন। সেকালের লোকেরা অবশ্য এই সকল কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করেন নাই; কিন্তু এখনকার দিনে, তাঁ'রা যে-সব অদ্ভুত জানোয়ারের কথা লিখিয়াছেন, উপকথার বাহিরে তাহাদের দেখা পাওয়া যায় না।

নিকোলো দে কন্তি নামক একজন সওদাগর প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে দক্ষিণ-ভারতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদের চৈতন্যদেবের সময়ের লোক। মুসোলিনীর দেশ ইটালীতে তাঁর জন্ম, ঐ দেশেরই ভিনিস নগরে তাঁর বাড়ী ছিল। ঠিক কোন খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু বছর পঁচিশ দমস্কস্, ভারতবর্ষ, লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। বিদেশে বেড়াইবার সময় তিনি ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়াই তাঁহার দস্তুর মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিবার ইচ্ছা হইল। খ্রীষ্টানদিগের শাস্ত্রে মাথা মুড়াইয়া গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্মগুরু পোপ পাঁতি দিলেন যে, তাঁহার খাস মুন্সীর কাছে কন্তিকে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে হইবে। কন্তি এত সহজে জাতে উঠিতে পারিবেন মনে করেন নাই, খুসি হইয়াই তিনি পোপের খাস মুন্সীর কাছে দেশ-বিদেশের গল্প বলিলেন। খাস মুন্সী ছিলেন পণ্ডিত লোক। তিনি লাটিন ভাষায় কন্তির ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিলেন। লাটিন আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষার মাসতুতো বোন; অর্থাৎ এই দুইটি ভাষার মধ্যে অনেক মিল আছে। আর সংস্কৃত ভাষার এখন যেমন

সাধারণ লোকের মধ্যে চলতি নাই, লাটিন ভাষাও তেমনি পণ্ডিত সমাজে ছাড়া আর কোথাও চলে না। কাজেই অনেকদিন পর্য্যন্ত কন্তির ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কথা বেশী লোকের জানা ছিল না। পর্ত্তুগীজেরা তখন পশ্চিম ভারতের গোটা কয়েক বন্দর দখল করিয়াছে, তাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল রকমের খবর জানিবার আগ্রহ তাহাদের ছিল। সেইজন্য একজন পর্ত্তুগীজ পণ্ডিত কন্তির পুঁথি সংগ্রহ করিয়া নিজের দেশের ভাষায় তর্জ্জমা করেন। অনেক দিন পরে ইটালীর একজন পণ্ডিত কন্তির মূল পুঁথি খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মাত্র দুইশত বৎসর আগে অলিভা নামক একজন ফরাসী পাদ্রী কন্তির মূল পুঁথি বাহির করেন। ৯০।৯৫ বছর আগে এই পুঁথির তর্জ্জমা বাহির হইয়াছে। কন্তি যে সব আজব জানোয়ারের কথা শুনিয়াছিলেন, এখন তাহাদের কথা তোমাদিগকে বলিব।

কন্তি বলেন যে মালাবার প্রদেশে নাকি মস্ত বড় বড় সাপ ছিল। বিরক্ত না করিলে তাহারা মানুষের কোন অনিষ্ট করিত না। ছোট ছোট ছেলেদের তা'রা খুবই ভালবাসিত। তাই দুষ্ট লোকেরা ছেলে দেখাইয়া এই নিরীহ সাপদের জঙ্গলের বাহির করিত। ঐ দেশেই নাকি আর এক রকম সাপ ছিল, তাদের চারখানা পা আর কুকুরের মত বাঁকা লেজ। এই চতুষ্পদ সাপগুলিও নাকি নিরীহ, আর মালাবারের লোকেরা এই আজগুবি সাপের মাংস খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিত।... দশ বারো হাত লম্বা সাপ কেবল মালাবারে কেন ভারতবর্ষের

অনেক জায়গায়ই আছে। কিন্তু সে সব ময়াল সাপ ছোট ছেলে পাইলে ফলার করিতেই চায়, মোটেই আদর করে না। কন্তির সময়ে বোধ হয় সাপেদের স্বভাব চরিত্র এখনকার চেয়ে ঢের ভাল ছিল। চতুষ্পদ সাপ পাইলে বোধ হয় পৃথিবীর সকল চিড়িয়াখানার কর্ত্তারাই আহ্লাদে আটখানা হইবেন। দৈবাৎ যদি দুই একটা সাপের লেজের দিকে ছোট ছোট পায়ের মত দেখা যায়, তাহা হইলেই পণ্ডিত-মহলে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। এক সময় হয়ত সাপেদেরও অন্যান্য সরীসৃপের মত চারিখানা পা-ই ছিল। কিন্তু সে কন্তির জন্মের লক্ষ লক্ষ বছর আগে। মালাবারের চতুষ্পদ সাপের সন্ধান এখন আর কেহ দিতে পারে না। কন্তি দেশে ফিরিবার পরই বোধ হয় সেই আজব বিষধরেরা গোষ্ঠিশুদ্ধ মানুষের পেটে গিয়াছে।

কন্তি যে কেবল চার-পা-ওয়ালা সাপের কথাই বলিয়াছেন তাহা নহে। পোপের খাস মুন্সীর নিকট তিনি ডানাওয়ালা সাপের গল্পও করিয়াছিলেন। ডানাওয়ালা সাপেরা থাকিত গাছে। বাদুড়ের মত তাহাদের দুইখানা পাখা ছিল। এই পাখা দিয়া তাহারা খুব তাড়াতাড়ি উড়িয়া বেড়াইতে পারিত। এই সাপগুলি নাকি আকারে খুবই ছোট ছিল, লম্বায় তাহারা একহাতের বেশী বড় হইত না। কিন্তু আকারে ছোট হইলে হইবে কি—এই জাতের এক একটা সাপের থাকিত সাত সাতটা মাথা! এদের নিঃশ্বাসের বিষেই মানুষ, গরু ঢলিয়া পড়িত। মালাবারের লোকদের সৌভাগ্য যে, সাত মাথাওয়ালা ছোট সাপও একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া

গিয়াছে, নইলে সমস্ত দেশটাই ইহাদের নিঃশ্বাসের বিষে উজাড় হইয়া যাইত।

উপকথায় তোমরা নিশ্চয়ই জলপরী বা জলমানুষদের কথা শুনিয়াছ। কন্তির পুঁথিতে তাহাদের খবরও পাওয়া যায়। তিনি সে'বার জাহাজে চড়িয়া কোচিন নগরে যাইতেছিলেন। কোচিন নগর একটা মস্তবড় নদীর মোহানায়। একদিন রাত্রিতে এই নদী দিয়া যাইবার সময়ে তিনি তীরে অনেকগুলি আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। কন্তি মনে করিয়াছিলেন যে, জেলেরা নদীতীরে আগুন জ্বালিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহযাত্রীরা বলিল ওগুলি ইসেপদের আলো। ইসেপদের মাছও বলা হয়, দানবও বলা যায়। তা'রা থাকে সমুদ্রের তলে। জাহাজের নাবিকেরা নাকি দু-একটা ইসেপ ধরিয়াছিল। তাদের চেহারা অবিকল মানুষের মত, এমন কি মাদী ইসেপ-গুলাও দেখিতে ঠিক ডাঙ্গার মেয়েদের মত। যাক, কন্তি নিজের চোখে ইসেপ দেখেন নাই, নাবিকদের মুখে শুনিয়াই গল্প করিয়াছেন। রাত্রি হইলে নাকি ইসেপরা তীরে উঠিয়া কাঠকুটা কুড়াইয়া এক জায়গায় জড় করে। তারপর পাথরে ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়। এই আলো দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তীরের কাছে আসে আর ইসেপরা সেই মাছগুলিকে ধরিয়া খায়। লাটিন ভাষায় লেখা কেতাবে যখন সাগরের তলনিবাসী মৎস্যনর ও মৎস্যনারীর এমন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ত আর তাহাদের কথা অবিশ্বাস করা চলে না! আমি নিজেও একবার মালাবার উপকূলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম,

কিন্তু আমার নিতান্তই দুরদৃষ্ট, একটা জলমানুষও আমার চোখে পড়িল না। আমার ঐ অঞ্চলের এক বন্ধু বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যার পর মধ্যে মধ্যে নদীর মোহানায় জল-ঘোড়ারা কখনও কখনও মাথা তুলিয়া চারিদিকে তাকায়। কিন্তু সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে কি আর বরুণদেবের ঘোড়া চেনা যায়? তাই ও চেষ্টা কখনও করি নাই।

কন্তি নিজের চোখে যে সব জানোয়ার, ফল-ফুল, বৃক্ষ-লতা দেখিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণে কোন ভুল নাই। কানে শোনা 'আর চোখে দেখার প্রভেদই ত এই। হাতী ধরার যে বিবরণ তিনি দিয়াছেন তাহা একেবারেই নির্ভুল। আর একটা জানোয়ারের কথা তিনি বলিয়াছেন; তাহার শূকরের মত মাথা, ষাঁড়ের মত লেজ, কপালে হাতখানেক লম্বা একটা শিং, আকার প্রায় হাতীর মতন, হাতীর সঙ্গে এই জানোয়ারের নাকি দেখা হইলেই লড়াই হয়। জানোয়ারটার নাম না করিলেও এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কন্তি গণ্ডারের কথা বলিতেছেন। আম, কাঁঠাল, বাঁশ, তাল প্রভৃতি ফল ও গাছ তিনি নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন। কন্তির ভাষায় তোমাদের কাঁঠালের কথা বলিতেছি—এদেশে এক জাতের অসংখ্য গাছ জন্মে। এই গাছের গুঁড়িতে ফল হয়। ফলগুলি দেখিতে অনেকটা আনারসের মত। ফলগুলি এত বড় যে, একজন লোকের তুলিতে কষ্ট হয়। ফলের খোসা সবুজ ও পুরু, কিন্তু আঙ্গুলের চাপে ভাঙ্গিয়া যায়। ভিতরে ডুমুরের আকৃতি দুইশ', আড়াইশ' মিষ্টি আতা। আতাগুলির

ভিতরে বাদামের মত (Chestnut) শক্ত বীচি। এগুলিও বাদামের মতই ভাজিয়া খাইতে হয়। না কাটিয়া আগুনে ফেলিলে বীচিগুলি বাদামের মত শব্দ করিয়া ফাটে।

কন্তি ভারতবর্ষের অনেক জায়গাই ঘুরিয়াছিলেন। তিনি এদেশের লোকদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব-চরিত্র, ধন-সম্পদের বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিষয় অবশ্য তাঁহার শোনা কথা নহে। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। বড় হইয়া তোমরা যে সকল বিদেশী পর্য্যটক এদেশের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বই পড়িও। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিও, কানে শোনা কথার চেয়ে চোখে দেখা বিষয় বেশী বিশ্বাসযোগ্য।



বাকলা

এখনকার বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জিলায় মুসলমান আমলে বাকলা নামক একটি ছোট হিন্দুরাজ্য ছিল। রাজ্যটি ছোট হইলেও সেকালে বাকলার রাজার বেশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। খৃষ্টীয় ১৫৫৯ সালে বাকলার রাজা পরমানন্দ রায়ের দূতেরা গোয়ায় গিয়া তথাকার রাজ-প্রতিনিধিদের সহিত সন্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তখন বাকলা ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এতদূর উন্নতি করিয়াছিল যে,

পর্ত্তুগীজেরা তাহাদের বাণিজ্যতরী চট্টগ্রামে না পাঠাইয়া বাকলায় পাঠাইতে স্থির করিয়াছিল। সন্ধিপত্র হইতে দেখা যায় যে, সে সময় বাকলার বণিকেরা পূর্ব্বে চীন ও পশ্চিমে আরব দেশ ও পারস্যের সহিত ব্যবসায় করিত। ১৫৮৩ সালে র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক একজন ইংরাজ পর্য্যটক বাকলার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। এই রাজধানী যে কোথায় ছিল, তাহা এখন আমরা জানি না। হয়ত জলপ্লাবনে এই সহরটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, না হয় বাঙ্গালার বহু পল্লী ও নগরের ন্যায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ লিখিয়াছেন যে, "বাকলার রাজা বেশ ভাল স্বভাবের লোক। তিনি বন্দুক ছুঁড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার রাজ্যটি বেশ বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। সেখানে অনেক চাউল, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হয়। সহরের রাস্তাগুলি বেশ চওড়া এবং বাড়ীগুলি খুব সুন্দর ও উঁচু। বাকলার লোকেরা কেবল কটিবাস পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা গলায়, হাতে ও পায়ে রূপা তামা ও হাতীর দাঁতের অনেক অলঙ্কার পরে।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ফনসেকা (Fonseca) নামক একজন পর্ত্তুগীজ পাদ্রী বাকলার রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তখন রাজা রামচন্দ্র বাকলার অধিপতি। সে সময় তাঁহার বয়স ছিল মোটে আট বৎসর। ইনি পরে যশোহরের বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাদ্রী সাহেব শিশুরাজার সৌজন্য, ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বাকলার

রাজা পর্ত্তুগীজদিগের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলে অনেক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী ছিল। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে বাকলা রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার তোমাদিগকে বাকলার একজন রাজার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্প বলিব। রামচন্দ্রের রাজত্বের পর ক্রমশঃ বাক্লার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। বাকলার রাজারা তখন মুসলমান বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষে বরিশালের অন্তর্গত চাখার গ্রামের (মৌলবী ফজলুল হক সাহেব এই গ্রামের অধিবাসী) মেন্দি মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা সরফুদ্দীন মজুমদার বাকলার রাজা উদয়নারায়ণকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। তখনকার নবাবের সহিত মজুমদারদিগের একটি ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং নবাব দরবারে তাঁহাদের খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তথাপি উদয়নারায়ণ নবাবের নিকটই সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। উদয়নারায়ণ অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন। নবাব তাঁহার আবেদনের উত্তরে বলিলেন যে, উদয়নারায়ণ যদি একটা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন। একাকী একটা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করা সামান্য কথা নয়; কিন্তু উদয়নারায়ণ নির্ভয়ে নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই অদ্ভুত যুদ্ধের জন্য নবাবের প্রাসাদে একটি আসর প্রস্তুত হইল। দর্শকেরা রহিলেন উপরে অনেক দূরে নিরাপদ জায়গায়। আর নীচে একাকী উদয়নারায়ণ আর মস্তবড় একটা বাঘ।

মজুমদারেরা হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, বাঘের হাতেই তাঁহাদের শত্রু নিপাত হইবে ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না—মানুষের হাতেই বাঘ মরিল। বিজয়ী উদয়নারায়ণ তখন নবাব সাহেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার শৌর্য্যের পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার পত্নীও বাঘে মানুষে লড়াই দেখিতে আসিয়াছিলেন। অতবড় জমিদারীটা তাঁহার ভাইদের হাতছাড়া হইয়া যায়, ইহা তিনি মোটেই ইচ্ছা করিতেন না। তিনি হঠাৎ একটা কলার খোসা উদয়নারায়ণের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"এই নাও তোমার পুরস্কার।" উদয়নারায়ণ যেমন বীর তেমনই প্রত্যুৎপন্নমতি। বরিশালের ভাষায় ফলের খোসাকে বলে বাকলা। তিনি সেই অবজ্ঞার দান মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"বেগম সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ। তাঁহার অনুগ্রহে আবার আমার বাকলা ফিরিয়া পাইলাম।" নবাব উদয়নারায়ণের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিতে আরও সন্তুষ্ট হইলেন। উদয়নারায়ণ সত্য সত্যই বাকলার জমিদারী ফিরিয়া পাইলেন।

এই গল্পটি সত্য কিনা আমরা জানি না। কোন নবাবের নিকট উদয়নারায়ণ শক্তির পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের (বাকলার) রাজাদিগের নিকট উদয়নারায়ণকে প্রদত্ত নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মোহর যুক্ত তিনখানি ফরমান ছিল। সুতরাং বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া না হউক, অন্যপ্রকারে সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া তিনি হয়ত মুর্শিদকুলী অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী নবাবের অনুগ্রহ লাভ

করিয়াছিলেন। বরিশাল জিলায় সুন্দরবনে বাঘের অভাব নাই। যাঁহারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, ডাঙ্গায় বাঘ বা জলে কুমীরকে তাঁহাদের ভয় করিলে চলিত না। সুতরাং উদয়নারায়ণের বাঘমারার গল্প কাল্পনিক নাও হইতে পারে। সেকালে বরিশালের লোকেরা একদিকে যেমন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া চীন ও আরব প্রভৃতি বহু দূর দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য জিলার লোকেরাও নানা ভাবে এইরূপ সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিল। আবার কি আমরা তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব না ?

সেকালের বাজারদর

কয়েক বছর আগে পোকায় কাটা ছেঁড়া একতাড়া কাগজের মধ্যে আমার দাদামহাশয়ের পূজার হিসাবের খাতা পাইয়াছিলাম। তখন আমাদের ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে বেশী না থাকিলেও বড়রা দলে বেশ ভারি ছিলেন। ছোট ছেলেদের জামা কাপড়ের চেয়ে—বড়দের ধুতি জামা জুতা দামে কিছু সস্তা নয়। কিন্তু তোমরা হয়ত বিশ্বাস করিবে না যে সেবছর দাদা মহাশয় কাপড়ের দোকানে খরচ করিয়াছিলেন মাত্র ছাব্বিশ টাকা কয়েক আনা!

দাদামশায়ের সে খাতায় যাট বছর আগের বাজারদরের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহী আমলে অর্থাৎ তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে জিনিসপত্র জলের দরে বিকাইত। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর আফ্রিকা হইতে ইবন্ বতুতা নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত, ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁর একটা বাই ছিল। একপথে তিনি কখনও দুইবার যাইতেন না। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্য্যন্ত অনেক দেশে বেড়াইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া

গিয়াছেন যে, বাঙ্গালাদেশের মত সস্তার বাজার তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

১৫১৮ সালে অর্থাৎ চারিশত চল্লিশ বৎসর আগে দোম জোয়াঁয়ো লীমা নামক এক পর্ত্তুগীজ ভদ্রলোক বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। কেবল নূতন দেশ দেখা তাঁ'র উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বাক্সবোঝাই টাকা নিতে তিনি আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের দেশের রাজার নিকট চিঠি লিখিয়া এখানকার বাজারদর জানাইয়াছিলেন। তখন নাকি বাঙ্গালার বাজারে টাকায় চারি মণ ভাল চাউল, ছয় পয়সায় কুড়িটা মুরগী ও তেইশটা হাঁস এবং তিন আনায় একটা দুধেল গাই পাওয়া যাইত। সেকালে আবার গোলাম ও বান্দী কেনাবেচা চলিত। একটি গোলামের দাম ছিল আট আনা—আর বান্দীর দাম ছিল ঠিক উহার দ্বিগুণ।

দোম জোয়াঁয়ো লীমার অনেক পরে—১৬৫৬ সালে একজন ফরাসী ডাক্তার ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসেন। তিনি প্রায় একযুগ বা বারো বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। এই ভদ্রলোকের নাম ফ্রান্সোয়া বর্ণিয়ে। তিনি নূতন নূতন দেশ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন; তাই একবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন মুরগীর দাম প্রায় এগারগুণ চড়িয়া গিয়াছে। ১৫১৮ সালে ছয় পয়সায় কুড়িটা মুরগী পাওয়া যাইত, বর্ণিয়ে যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তখন কুড়িটা মুরগীর দাম এক টাকা। ছাগল ভেড়ার দামও নাকি এই রকমই সস্তা ছিল। আর বাঙ্গালা

দেশ হইতে চাউল, চিনি, সূতী ও রেশমী কাপড় যে দেশ-বিদেশে কত রপ্তানী হইত, তাহার হিসাব দেওয়াই শক্ত। তখন নাকি বিদেশী লোকেরা বাঙ্গালায় আসিয়া আর দেশে ফিরিবার নামও করিত না।

বাদশাহ শাহজাহান ও ঔরংজীবের আমলে জীন ব্যাপ্তিস্ত তাভার্ণিয়ে নামক একজন ফরাসী সওদাগর ভারতে আসেন। তিনি জহরতের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার বিবরণে দেখা যায় যে, সে সময় বাঙ্গালাদেশে হীরার খনিও ছিল। ১৬৬৫ সালে তিনি আগ্রা হইতে ঢাকা আসিবার পথে বাঙ্গালাদেশের খাজানার গাড়ী দেখিয়াছিলেন। ছয় বলদে টানা একশত দশখানা গাড়ীর প্রত্যেকখানিতে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাকা বোঝাই ছিল! তাভার্ণিয়ে বলেন, সেকালে সরকারী সমস্ত খরচ বাদে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা বাদশাহী খাজানাখানায় যাইত। তখনকার বাজারদর হিসাব করিলে পঞ্চাশলক্ষ টাকা নিতান্ত কম মনে করা যায় না। তাভার্ণিয়ে বড়মানুষদের সঙ্গে কারবার করিতেন। তিনি ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী প্রভৃতি বড় বড় সহরে ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বে র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ নামক একজন ইংরাজ বণিক শ্রীপুর, বাকলা, সোনারগাঁও প্রভৃতি সহরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বাকলা সহরের এখন আর চিহ্নও নাই, শ্রীপুর পদ্মার গর্ভে, সোনারগাঁও এখন সামান্য গ্রাম। অথচ তখন এইসব জায়গাই ছিল বাঙ্গালাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। এইসব সহরের বাজারে লক্ষ

লক্ষ টাকার কাপড়, চিনি ও অন্যান্য জিনিসের বেচাকেনা হইত।

এখন আমাদের দেশের সে সম্পদের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। হীরার খনি কবে শেষ হইয়াছে কে বলিবে ? বাঙ্গালার সূতী ও রেশমী কাপড় বিদেশে চালান হওয়া দূরের কথা—এখন সস্তা বিদেশী কাপড়ে বাঙ্গালার বাজার ভরিয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েদের সস্তা খেলনা পর্য্যন্ত এখন জাপান হইতে আসে। বড় হইয়া তোমরা যদি আবার দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে পার তবেই না তোমরা সোনারচাঁদ ছেলেমেয়ে।



একনাথ

গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠন নগর। পৈঠন মহারাষ্ট্রের নবদ্বীপ। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সেখানে বাস, বহু বিদ্যার্থীর সেখানে সমাবেশ। কিন্তু পৈঠন কেবল একটি বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ নহে, দক্ষিণের বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রও বটে। বৈষ্ণব চূড়ামণি ভানুদাস ও তাঁহার প্রপৌত্র একনাথ স্বামীর নিবাস ছিল পৈঠনে। ভানুদাসের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া স্বয়ং বিষ্ণু নাকি তাঁহার বংশে অবতীর্ণ হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস একনাথ স্বামী বিষ্ণুর অবতার।

অতি অল্প বয়সেই একনাথের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়াছিল। তিনি বাল্যেই পিতামাতৃহীন। পিতামহ ও পিতামহীর অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া দেবগিরির প্রসিদ্ধ সাধু জনার্দ্দন

স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনার্দ্দন স্বামী গৃহস্থ ত ছিলেনই, দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যও করিতেন।

তিনি নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত ধর্ম্মানুশীলনের বিরোধ নাই। একনাথ তাঁহার যোগ্য শিষ্য। গুরুর অনুগ্রহ লাভ এবং ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকারের পরে তিনি কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করিয়া পৈঠনে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে গুরুর আদেশে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন। সাধারণ সংসারী হইতে তাঁহার জীবনের পার্থক্য ছিল অনেকখানি। সাধু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও তিনি পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার করেন নাই; বরঞ্চ বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে বলিয়াছেন—লেখাপড়া আমি জানি না। সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহ নিয়মগুলি আমার বুদ্ধির অতীত। সাধারণের হিতার্থে তিনি মারাঠী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও কবি-যশের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। প্রত্যহ প্রাতে তিনি গোদাবরীতে স্নান-সন্ধ্যা করিতেন, তারপর চলিত গৃহদেবতার অর্চ্চনা। দিবসের তৃতীয় প্রহরে গৃহ-প্রাঙ্গণে পুরাণ পাঠ করিতেন, সেখানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ কাহারও আসিবার বাধা ছিল না। রাত্রির দ্বিতীয় যাম পর্য্যন্ত হইত কীর্ত্তন। একনাথের কণ্ঠ ছিল সুমধুর, ভক্তি ছিল গভীর, কবিত্ব ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি যখন মধুর কণ্ঠে সহজ ভাষায় ভগবানের মহিমা গান করিতেন, তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত কোন শ্রোতাই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না।

সেকালে অব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। স্ত্রীলোকের নিকট বেদ ব্যাখ্যা করাও নিষিদ্ধ ছিল। ইতরজাতির সংস্পর্শ ব্রাহ্মণেরা সতর্কতার সহিত পরিহার করিয়া চলিতেন। সুতরাং একনাথের আচরণ পৈঠনের ব্রাহ্মণ সমাজের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই।

একনাথের ধর্ম্মমত ছিল অত্যন্ত সরল। তিনি অতিথিকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন; সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তিনি ভক্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভক্ত শূদ্রের উচ্চে স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার আচরণের সহিত তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতের কোনই অনৈক্য ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত গুটি কয়েক গল্প বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে, একনাথ স্বামীর আদর্শ কিরূপ উচ্চ ছিল এবং ধর্ম্মে কিরূপ নিষ্ঠা ছিল।

সেবার সপ্তাহ ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ষায় কেহ বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারেন না। হাট-বাজারও বসে না। ঘরে হয়ত চাল-ডালের অভাব নাই; কিন্তু জ্বালানী কাঠের অভাবে সকলেরই রন্ধনের অসুবিধা হইতেছে। প্রবল বৃষ্টিতে কাঠ ভিজিয়া গিয়াছে, আগুন জ্বালাইতে বড়ই কষ্ট হয়। এই সময় গভীর রাত্রিতে তিনটি ব্রাহ্মণ পৈঠনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও তাঁহারা কোথাও রাত্রির আশ্রয় বা ক্ষুধার অন্ন পাইলেন না। শেষে একজন তাঁহাদিগকে বলিল, নগরপ্রান্তে একনাথের বাড়ীতে

যাও, সে অত্যন্ত অতিথি-বৎসল। তাহার গৃহে বোধ হয় তোমাদের সেবার ত্রুটি হইবে না। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত তিনটি ব্রাহ্মণ সিক্তবস্ত্রে একনাথের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। একনাথের ঘরেও শুকনা কাঠ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের হাতে শয়নের পালঙ্ক ভাঙ্গিয়া চেলা করিয়া দিলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী সেই গভীর রাত্রিতে অতিথিদের স্নানের জন্য জল গরম করিলেন, আহারের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। দীর্ঘ উপবাসের পর ব্রাহ্মণেরা একনাথের আতিথেয়তায় পর্য্যটনের ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দূর করিয়া বিশ্রাম করিলেন। অতিথিসেবা সমাপ্ত হইলে একনাথ ও তাঁহার পত্নী শয্যা গ্রহণ করিলেন।

কেবল যে ব্রাহ্মণ অতিথিরা একনাথের গৃহে সমাদর লাভ করিতেন—তাহা নহে। অতিথি মাত্রই দেবতা, সুতরাং অতিথিসেবায় জাতি বিচার করিতে নাই—ইহাই ছিল একনাথের বিশ্বাস। একবার পিতৃপুরুষদিগের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-দিনে একনাথ নগরের কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের অন্ন প্রস্তুত, ব্রাহ্মণেরা গোদাবরীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় জীর্ণবাস-পরিহিত তিনটি মুসলমান ফকির আসিয়া একনাথের গৃহে উপস্থিত। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত, কিছু খাইতে চাহেন। একনাথ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া শ্রাদ্ধের জন্য প্রস্তুত অন্ন মুসলমান অতিথিদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে নিজের হাতে তাম্বুল রচনা

করিয়া দিলেন। পরিতৃপ্ত অতিথিরা যখন ফিরিয়া যাইতেছেন, তখন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া উপস্থিত। একনাথের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহারা ত চটিয়া আগুন ঃ এমন স্পর্দ্ধা যে শ্রাদ্ধের অন্ন ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছের পাতে দেওয়া হইয়াছে! ভানুদাসের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে যে দেবদ্বিজের সম্মান রাখিতে জানে না! একনাথ বিনীতভাবে বলিলেন, আপনারা রাগ করিবেন না। ইঁহারা অতিথি, পক্বান্নের গন্ধ পাইয়াছিলেন। আঘ্রাণের দ্বারা উচ্ছিষ্ট অন্ন আপনাদিগকে দিতে পারিতাম না। তাই ইঁহাদিগকেই সেই অন্ন পরিবেশন করিয়াছি। ইঁহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদিগের জন্য রন্ধন হইতেছে। বেশী বিলম্ব হইবে না। ব্রাহ্মণেরা অবশ্য একনাথের অনুনয়ে শান্ত হইলেন না ঃ তাঁহাকে গালি দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে কিন্তু একনাথের চিত্তের প্রসন্নতার বিন্দুমাত্রও বিক্ষেপ হয় নাই।

এই গল্পের একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে। সেটা বোধ হয় বহুকাল পরের রচনা। একনাথ যখন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, তখন তাঁহার ভক্তেরা হয়ত রক্ষণশীল দলের তুষ্টির জন্য এই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন একনাথকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যদি এত বড়ই সাধু হইয়া থাক যে সাধারণ সামাজিক নিয়ম তোমার জানিবার প্রয়োজন হয় না, তবে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে ডাকিয়া খাওয়াইলেই ত চলে, আমাদের

মত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণকে জ্বালাতন করিবার দরকার কি? একনাথ বলিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ, ভগবান বিষ্ণু পর্য্যন্ত আপনাদের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। আপনাদের বাক্য বৃথা হইবে না। এই বলিয়া তিনি "ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" বলিয়া পিতৃপুরুষগণকে আহ্বান করিলেন। বিস্মিত ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, একনাথের আহ্বানে তাঁহার প্রপিতামহ ভানুদাস, পিতামহ চক্রপাণি, পিতা সূর্য্যনারায়ণ ভাস্বর মূর্ত্তিতে শ্রাদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্কন্ধে তাঁহাদের শুভ্র উপবীত, অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়।

আরও পরবর্ত্তীকালে মহারাষ্ট্রের কবি মহীপতি বলিয়াছেন যে, যে তিনটি ফকিরকে একনাথ শ্রাদ্ধীয় অন্নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর কেহ নহেন, মুসলমান-বেশধারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অপরে তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারিলেও ভক্তশ্রেষ্ঠ একনাথের নিকট তাঁহাদের পরিচয় গোপন ছিল না। আমার মনে হয় অতিথি বলিয়াই একনাথ অভ্যাগত ফকিরদিগকে দেবতার সম্মান দিয়াছিলেন, দেবতা বলিয়া নহে।

একনাথের অতিথিপরায়ণতা এবং ধৈর্য্যশীলতার চরম পরীক্ষা হইয়াছিল এক বিদেশী ব্রাহ্মণের নিকট। ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত। ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, আরও দুইশত টাকা তাঁহার প্রয়োজন। এই টাকার জন্য তিনি আসিয়াছেন পৈঠন সহরে। সহরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার দেখা হইল ব্রাহ্মণবংশজাত কতকগুলি পরশ্রীকাতর

দুষ্ট লোকের সঙ্গে। একনাথকে সকলে ভক্তি করে, ভালবাসে বলিয়াই ইহারা তাঁহাকে হিংসা করিত। তাহারা বিপন্ন ব্রাহ্মণকে বলিল—দুইশত টাকা তোমাকে আমরাই দিতে পারি যদি একটা কাজ করিতে পার। এই সহরে একা নামক এক বামুন আছে। বেটা নাকি দ্বিতীয় রিপুটাকে একেবারেই জয় করিয়াছে। ওকে যদি চটাইতে পার, তবে আমরাই তোমাকে দুইশত টাকা বখশিস দিব।

ব্রাহ্মণও ছিল নিতান্ত অবিবেচক। সে টাকার লোভে একনাথের ধৈর্য্য ও সংযম পরীক্ষা করিতে সম্মত হইল। একনাথ স্নান-সন্ধ্যা করিয়া ঠাকুরঘরে গৃহদেবতার পূজা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া একেবারে তাঁহার কোলের উপর বসিয়া পড়িল। অপরিচিত লোকের দ্বারা পূজার এরূপ বাধা হইলে কাহার না ধৈর্য্যচ্যুতি হয়? কিন্তু একনাথের রাগ হওয়া ত দূরের কথা, তিনি ব্রাহ্মণকে অজস্র সাধুবাদ করিতে লাগিলেন: ঠাকুর, আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ! তুমি অতিথি, আমার গৃহে আসিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছ, আমার অভ্যর্থনার অপেক্ষা তুমি রাখ নাই, আমার ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া তুমি নিজেই আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছ।

ইহাতেও কিন্তু এই মূঢ় ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল না। সে মনে করিল যে, আরও অশিষ্ট আচরণ করিলে হয়ত একনাথ ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিবেন না; তখন অনায়াসেই দুইশত টাকা পাওয়া যাইবে। একনাথ সমাদর করিয়া ব্রাহ্মণকে

আহার করিতে লইয়া গেলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বয়ং অতিথিকে অন্ন পরিবেশন করিতে আসিলেন। তিনি যেমন নত হইয়া ব্রাহ্মণের পাত্রে আহার্য্য দিবেন, অমনি সেই মূর্খ হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার পিঠে চড়িয়া বসিল। একনাথ পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারেও অতিথির প্রতি রুষ্ট হইলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন সাবধান, যেন বেশী নড়াচড়া করিও না, পড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণ কষ্ট পাইবেন। রান্থ বাই একনাথের যোগ্যা স্ত্রী। তিনি বলিলেন—হরি পণ্ডিতকে (তাঁহাদের বালক পুত্র) পিঠে লইয়া কাজ করিবার অভ্যাস আমার আছে; ভয় করিও না, আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না। এই সাধু দম্পতীর ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া একনাথের নিকট সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। একনাথ হাসিয়া বলিলেন—এ কথা আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে ত আমি রাগ করিতাম। অযথা আপনার দুইশত টাকা লোকসান হইল।

একনাথ যেরূপ অতিথি মাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করিতেন, সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, সর্ব্বজীবেই নারায়ণ আছেন। একবার তিনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। প্রয়াগ হইতে গঙ্গাজলে কলসী ভরিয়া রামেশ্বরের পথে চলিয়াছেন। সেখানে ঐ পবিত্র সলিলে রামেশ্বর শিবের অভিষেক করিবেন। প্রায় রামেশ্বরের কাছে আসিয়াছেন, এমন সময় একনাথ দেখিলেন, পথের ধারে একটি গাধা উত্তপ্ত বালুর উপর পড়িয়া তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছে। এত যত্নে এত পরিশ্রম

করিয়া শিবের অভিষেকের জন্য যে গঙ্গাজল লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বিনা দ্বিধায় সেই মুমূর্ষু গাধাকে পান করাইলেন। সঙ্গীরা দুঃখ করিয়া বলিলেন—ছি ছি! এত দীর্ঘ পথ আসিয়া শেষে তীর্থযাত্রা নিষ্ফল হইল। একনাথ হাসিয়া বলিলেন—আমার আর রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। এইখানেই আমার তীর্থযাত্রা সার্থক হইয়াছে। ভাগীরথীর জল নারায়ণকে সমর্পণ করিলাম।

একনাথের কীর্ত্তন শুনিতে সর্ব্বজাতির সর্ব্বশ্রেণীর লোক আসিত। পৈঠন নগরে রান্যা নামক এক মহার বাস করিত। মহারেরা অত্যন্ত নীচ জাতি। নগরের মধ্যে তাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই। স্পর্শ করা দূরে থাকুক, মহারের ছায়া মাড়াইলে ব্রাহ্মণকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। রান্যা প্রত্যহ রাত্রে স্ত্রীর সহিত একনাথের কীর্ত্তন শুনিতে আসিত। যেখানে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা বসিত, তাহার কাছে যাইতেও তাহার সাহস হইত না। প্রাঙ্গণের বাহিরে এক জায়গায় বসিয়া যুক্তকরে দীনভাবে ভক্তের মুখে ভক্ত-বৎসলের মহিমা-গান শ্রবণ করিয়া ধন্য হইত। সেদিন একনাথ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের কথা বলিতেছেন—অর্জ্জুন দেখিলেন, সহস্রবাহু, সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ ভগবানের দেহে সমস্ত চরাচর রহিয়াছে, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষ পশুপক্ষী সকলেই সেই দেবদেহে অবস্থান করিতেছে। রান্যা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—ভগবান যখন বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন তখন পাপিষ্ঠ রান্যা কোথায় ছিল? একনাথ স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন

—"তুমিও ছিলে সেই বিশ্বরূপে বিলীন হইয়া।" রান্যা মহারের সমস্ত সংশয় দূর হইল। সেও ভগবানের অংশ, সেও দেবতা, সে তুচ্ছ নহে, ঘৃণ্য নহে, তাহার মধ্যে নারায়ণ আছেন, ভগবানের বিশ্বে তাহারও স্থান আছে, বিশ্বরূপে ভগবান অধম রান্যাকেও আপনার শরীরে স্থান দিয়াছিলেন।

দিনকয়েক পরে রান্যার স্ত্রীর বড়ই ইচ্ছা হইল, নিজের হাতে রান্ধিয়া একনাথকে খাওয়াইবে। একি অসম্ভব বাসনা! ব্রাহ্মণ একনাথ—মহারের ছায়া স্পর্শ করিলে যাঁহাকে স্নান করিতে হয়, তিনি অস্পৃশ্য মহারের গৃহে আহার করিবেন! কিন্তু তিনিই ত বলিয়াছেন যে, মহারের মধ্যেও মহাদেব আছেন। তিনি কি তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন না? রান্যা একদিন ভয়ে ভয়ে একনাথের নিকট তাহার স্ত্রীর একান্ত আকাঙ্ক্ষার কথা নিবেদন করিল। একনাথ বলিলেন, তোমার স্ত্রী কোন অন্যায় অনুরোধ করেন নাই। তোমরা উভয়েই সদাচারী বিষ্ণুভক্ত, তোমাদের গৃহে আমি অবশ্যই আহার করিব। এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য তাঁহাকে সামাজিক দণ্ডভোগও করিতে হইয়াছিল। এক সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র হরি পণ্ডিতও পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে কবি মহীপতি মহাপুরুষের আচরণের সহিত সামাজিক আচারের সমন্বয় করিবার জন্য একটি গল্প রচনা করিয়াছিলেন। মহারের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ পাইয়াই ব্রাহ্মণেরা একনাথের গতিবিধির উপর কড়া নজর

রাখিতে লাগিলেন। হাতে হাতে ধরিতে পারিলে এবার তাঁহাকে অব্যাহতি দিবেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা রান্থার ঘরে ভোজননিরত একনাথকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠিক সেই সময়েই তাঁহার বাড়ীর কাছের ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, একনাথ নিজের ঘরে অতিথিদিগের সহিত বসিয়া আহার করিতেছেন। একই সময়ে একই ব্যক্তির দুই জায়গায় উপস্থিতি অসম্ভব। তবে কি ভগবান ভক্তের মান রক্ষার জন্য স্বয়ং একনাথের রূপে রান্থার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেছেন? অসম্ভব কি?

আর একটি গল্প বলিয়া একনাথের কথা শেষ করিব। পৈঠনের নিকটস্থ কোন গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি মূকবধির পুত্র ছিল। ছেলেটি বোবা, বুদ্ধিশুদ্ধিও কিছু নাই, কিন্তু মিঠাইমণ্ডার লোভ তাহার অসাধারণ। দরিদ্রের ঘরে নিত্য মিঠাইমণ্ডা কোথায় জুটিবে? একনাথের ভক্তমণ্ডলী প্রত্যহ তাঁহাকে নানাদ্রব্য উপহার দিত। ভক্তের দানে তিনি অতিথিসেবা করিতেন। তাঁহার গৃহে সুখাদ্যের অভাব ছিল না। একদিন সেই মূক বালকের মাতা একনাথের নিকট পুত্রকে লইয়া আসিলেন। বলিলেন—আমি দরিদ্র, এই বোবা রাক্ষসের লোভের আহার যোগান আমার অসাধ্য হইয়াছে। একনাথ উত্তর করিলেন—আজ হইতে আমি এই বালকের ভার লইলাম। ইহাকে এখানেই রাখিয়া যাও। তাড়নায় যাহা সম্ভব না হয়, স্নেহে তাহা সম্ভব হয়। বালক ক্রমে ক্রমে একনাথের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িল। তাঁহার চেষ্টায়

মূকের মুখে ক্রমে ক্রমে কথা ফুটিল। একনাথ তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। শেষে সেই মাতৃপিতৃপরিত্যক্ত অবোধ বালকই একনাথের অসমাপ্ত রামায়ণ সম্পূর্ণ করিয়াছিল।

একনাথ কখনও সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন নাই। তিনি জাতিভেদ রহিত করিতে চাহেন নাই। সামাজিক কোনো কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনও করেন নাই। তিনি নীরবে আপনার কাজ করিয়া গিয়াছেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনি মারাঠী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মারাঠী সাহিত্যে তাঁহার দান অমূল্য। তাহার চেয়েও অমূল্য তাঁহার সাধু জীবনের অবদান। জনের মধ্যে তিনি জনার্দ্দনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, নরের মধ্যে দেখিয়াছিলেন নারায়ণকে। তাই মহারের গৃহে অন্নগ্রহণে তাঁহার আপত্তি হয় নাই, তাই শ্রাদ্ধের অন্ন তিনি স্বচ্ছন্দে মুসলমানকে পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাই আশ্রয়প্রার্থী তস্করের সেবায়ও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। সর্ব্বজীবে তিনি শিবের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই রামেশ্বরের জন্য বাহিত গঙ্গোদকে তিনি গর্দ্দভের সেবা করিয়াছিলেন। মানুষের সেবাই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চাহেন নাই, অশিক্ষিতজনের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

আমরা এই মহাপুরুষকে প্রণাম করি।



গুণগ্রাহিতা

মারাঠা-বীর শিবাজীর নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তিনি সামান্য একজন জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। কিন্তু নিজের প্রতিভায় শেষে একটি মস্ত বড় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। অনেকের ধারণা ছিল যে, তিনি স্বয়ং শিবের অবতার। যাঁহারা সত্য সত্যই বড় তাঁহারা কাহাকেও ছোট বলিয়া তুচ্ছ করেন না, শিবাজীও করিতেন না। তাই তিনি নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপদেশও অগ্রাহ্য করিতেন না।

শিবাজীর শত্রুদের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ-ই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তাঁহার মস্ত বড় সাম্রাজ্য, অসংখ্য সিপাহী, প্রচুর কামান, আর ধন-দৌলতের ত কথাই নাই। এদিকে শিবাজী পাহাড়ে মুল্লুকের মানুষ, তাঁহার ছোট রাজ্যে যেমন অল্প

লোক—তেমনিই অপ্রচুর ফসল। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গেও তাঁহার তেমন সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তিনি খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়াই এতগুলি প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও টিকিয়া ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ মুখে তাঁহাকে 'পাহাড়ে ইন্দুর' বলিয়া তুচ্ছ করিলেও মনে মনে বেশ ভয় করিতেন। কারণ, একদিন রাত্রির অন্ধকারে শিবিরে ঢুকিয়া শিবাজী বাদশাহের মামা শায়েস্তা খাঁকে খুন করিয়া ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ অতিকষ্টে জানালা দিয়া পলাইয়া গিয়া কোন মতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মারাঠাদের তরোয়ালের ঘায়ে তাঁহার একটা আঙ্গুল কাটা গিয়াছিল।

দিল্লীর বাদশাহের রাজ্যে সুরাটই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বন্দর। শিবাজী দুই দুইবার এই বন্দর লুঠ করিয়া অনেক ধনরত্ন লইয়া গিয়াছিলেন। একবার বাদশাহ নিজের রাজধানীতে পাইয়া শিবাজীকে বড়ই বেকায়দায় ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠা-বীর সেবারও বাদশাহের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া মিঠাইয়ের চুপড়িতে ঢুকিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। এই সব কারণে বাদশাহের কর্ম্মচারীরা মনে করিত—শিবাজী মানুষ ন'ন সয়তানের অনুচর; অথবা তাঁহার নিশ্চয়ই যাদুমন্ত্র জানা আছে।

আসল কথা শিবাজী ভাল করিয়া খবর না লইয়া কোন বিপদের কাজে হাত দিতেন না। তাঁহার গুপ্তচর ছিল অনেক। তাহারা খুব বিশ্বাসী এবং চতুর হইলেও শিবাজী

নিজেই অনেক সময় ছদ্মবেশে শত্রুদলের সন্ধান লইতে বাহির হইতেন বলিয়া মারাঠা দেশে প্রবাদ আছে। একবার তিনি কৃষকের বেশে শত্রু-সেনার সংবাদ লইতে বাহির হইয়াছিলেন। অজানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা ছোট গ্রামে যাইয়া রাত্রি হইয়া গেল। খাওয়ার জন্য তাঁহার ভাবনা ছিল না, দুই একদিনের অনাহার তিনি হিসাবের মধ্যেই ধরিতেন না। কিন্তু রাত্রিতে মাথা রাখিবার মত একটা জায়গা চাই।

গ্রামের একধারে এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়া শিবাজী অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। তখনকার অরাজকতার দিনে অচেনা লোককে সহসা কেহ জায়গা দিতে চাহিত না। কিন্তু ব্রাহ্মণী ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ। তিনি সে রাত্রির মত শিবাজীকে দাওয়ায় ঘুমাইয়া থাকিতে তো দিলেন-ই, অধিকন্তু অতিথিকে একেবারে অনাহারে থাকিতে দিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অথচ সেদিনকার মত তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণী তখন তাড়াতাড়ি পিঠুলীর মত একটা জিনিস তৈয়ারী করিয়া শিবাজীকে পরিবেষণ করিলেন। কলাপাতায় করিয়া তরল পদার্থ খাওয়া খুব সহজ নহে, ও অঞ্চলের লোকেরা এক হাতে কলাপাতার একটা দিক উঁচু করিয়া ধরিয়া আর এক হাতে তরল খাবারটা তুলিয়া খায়। শিবাজীর কিন্তু এ কায়দাটা জানা ছিল না, তাই তাঁহার বেজায় অসুবিধা হইতেছিল। সমস্ত পাতাময় খাবার ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একদিকে হাত দিলে আর একদিকে তাহা গড়াইয়া যায়।

শিবাজীর দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্রাহ্মণী হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন—'বাপু! অমন করিয়া কি খাইতে হয়? পাতার একদিক ভাল করিয়া ধরিয়া আর একদিক হইতে খাবার তুলিয়া খাও।'

ব্রাহ্মণী অবশ্য শিবাজীকে চিনিতেন না। তিনি সাধারণ-ভাবেই কথাটা বলিয়াছিলেন। শিবাজী ভাবিলেন—'তাইত! এতো খুব পাকা কথাই বলিয়াছে। যে রাজ্য জয় করিয়াছি তাহা বেশ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া, তবে তাহার ওধারের নূতন দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।' ভোর হইবার পূর্ব্বেই শিবাজী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণীও দিন কয়েক পরে অজানা অতিথির কথা একরকম ভুলিয়াই গেলেন।

মাস কয়েক পরে সকলে শুনিল—ছত্রপতি শিবাজীর সেনাদল সেই দিকে আসিতেছে। ভয়ে পুরুষেরা যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল; পলাইল না কেবল মেয়েরা। শিবাজীর কাছে মেয়েদের কোন ভয় ছিল না। অবশেষে যখন শিবাজীর সৈন্যেরা সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পলাতক ব্রাহ্মণের খোঁজ পড়িল। ব্রাহ্মণকে যখন পাওয়া গেল না, তখন শিবাজীর অনুচরেরা ব্রাহ্মণীকে তাহাদের রাজার নিকট লইয়া গেল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন যে, তিনি সামান্য একটা চাষা মনে করিয়া যাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং ছত্রপতি শিবাজী।

শিবাজী বলিলেন—'মা! তোমার আতিথ্যের কথা আমি

কখনও ভুলিব না। আর সেদিন তোমার নিকট যে অযাচিত উপদেশ পাইয়াছিলাম তাহাতেও আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে এই কাগজখানি দিলাম; তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে দিও।' ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সে কাগজখানি শিবাজীর দানপত্র। তিনি তাহাকে বাসগ্রামখানিই দান করিয়া গিয়াছেন। আজিও ব্রাহ্মণের বংশধরেরা সেই গ্রামে বাস করিতেছে, আজিও তাহারা শিবাজীর দানপত্রের বলে সেই গ্রাম ভোগ করিতেছে।

গল্পটা সত্য কিনা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কারণ তাহাদেরই একজন আত্মীয়ের কাছে আমার এই গল্পটি শোনা। কিন্তু তোমরাও যদি সাধারণ লোকের উপদেশ গ্রহণ করিতে পার, তবে তোমরাও যে শিবাজীর মত ভবিষ্যতে ভাল কাজ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আদর্শ প্রভুভক্তি

ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন এমন ধার্ম্মিকের অভাব ভারতবর্ষে নাই, প্রভুর জন্য শির দিয়াছেন এমন নির্ভীক বীরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যও অনেক মহাপুরুষ নানাপ্রকার দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ আদর্শ ব্যক্তি বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশেই বিরল। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্ততঃ এইরূপ একজন সর্ব্বত্যাগী প্রভুভক্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বাদশাহ ঔরংজীব তখন মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য দুর্গগুলি একে একে অধিকার করিতেছেন। মহারাষ্ট্রের তখন বড় দুর্দ্দিন। শিবাজীর সাধের স্বরাজ্য বোধ হয় আর থাকে না। মহাপুরুষ শিবাজী ধর্ম্মের নামে, স্বাধীনতার নামে তাঁহার স্বদেশবাসীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সাম্ভাজী পিতার ন্যায় আদর্শ-চরিত্রের পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না। তিনি

অকুতোভয়ে বাদশাহী ফৌজের সহিত অনেক বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তিনি বাদশাহের একজন কর্ম্মচারীর হস্তে বন্দী হইলেন। বাদশাহ্ জানিতেন শিবাজীর স্বরাজ্যের ভিত্তি তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ। মারাঠা নায়কেরা যতদিন শিবাজীর আদর্শ পরিত্যাগ না করিবে ততদিন তাহাদের দেশ জয় করা সহজ হইবে না। বাদশাহ্ সাম্ভাজীকে বলিলেন, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। সাম্ভাজী ধর্ম্মের বিনিময়ে প্রাণরক্ষার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি মরিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি শিবাজীর অযোগ্য পুত্র নহেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ধনে জনে বাদশাহ্ ঔরংজীবের সহিত মারাঠাদিগের তুলনাই হয় না। বার বার যুদ্ধে হারিয়াও তাহারা বাদশাহের প্রভুত্ব স্বীকার করিল না। শিবাজীর স্বরাজ্য যেমন করিয়াই হউক রক্ষা করিতে হইবে। শেষে একদিন চরম সঙ্কট উপস্থিত হইল। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা নায়কেরা তাঁহার শিশুপুত্র শাহুকে রায়গড়ের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে যুদ্ধ চালাইতেছিল। এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে রায়গড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ বাদশাহের করতলগত হইল। শাহু ও তাঁহার মাতা ঔরংজীবের হস্তে বন্দী হইলেন। তথাপি যুদ্ধ থামিল না। মারাঠা সৈন্য এক জায়গায় পরাজিত হইয়া আর এক জায়গায় মোগলের গতিরোধের চেষ্টায় সমবেত হইতে লাগিল। বাদশাহ্ ক্রমাগত জয়লাভ করিয়াও মারাঠাদেশ দখল করিতে পারিলেন

না। তাঁহার সৈন্যেরা ক্রমশঃ পথের শ্রমে ও যুদ্ধের ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে ঔরংজীব মারাঠাদিগের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

বাদশাহের শিবিরে বন্দী শাহু ও তাঁহার জননীর কোনপ্রকার অসুবিধা বা অনাদর হয় নাই। বালক শাহুকে ঔরংজীবের এক কন্যা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং সাধারণ বন্দীর ন্যায় ব্যবহার তাঁহার প্রতি কখনই করা হয় নাই। ঔরংজীবেরও শাহুকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সাম্ভাজীকে ধর্ম্মত্যাগ করাইতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার শিশুপুত্রকে বোধ হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান কঠিন হইবে না। তিনি হুকুম করিলেন, শাহুকে মুসলমান হইতে হইবে।

বন্দী মারাঠাদিগের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। শাহু যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় নিজের বুদ্ধিতে মুসলমান হইতেন, মারাঠারা হয়ত ক্ষুব্ধ হইত, কিন্তু অপমানিত বোধ করিত না। বিজেতার আদেশে বন্দী অবস্থায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা হীনতা আর কি আছে? শিবাজীর পৌত্র কি সেই হীনতা স্বীকার করিবেন? তাঁহার পিতা যে ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ যে ধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, শাহু কি সেই ধর্ম্ম বিজয়ী শত্রুর আদেশে পরিত্যাগ করিবেন? তাহা হইলে মারাঠাদিগের চরম অপমানের বাকী রহিল কি?

এই বিপদে শাহুর আত্মীয়েরা বাদশাহের কন্যার শরণ লইলেন। তাঁহার অনুরোধে হয়ত বা ঔরংজীব তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতেও পারেন। বাদশাহ্‌জাদী শাহুকে সত্য সত্যই ভালবাসিতেন। তিনি পালিত পুত্রের সম্মান রক্ষার জন্য পিতার দ্বারস্থ হইলেন। কন্যার একান্ত অনুনয়ে বাদশাহের সঙ্কল্প একটু বিচলিত হইল। তিনি আদেশ করিলেন যে, বংশমর্য্যাদায় শাহুর সমকক্ষ আর কোন মারাঠা অভিজাত যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা হইলে শাহুকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু কোন মারাঠা অভিজাত নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রভুর ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ?

প্রতাপরাও গুজর ছিলেন শিবাজীর প্রধান সেনাপতি। প্রভুর কর্ম্মেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিবাজী সেনাপতির বীরত্বের ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত প্রতাপ রাওর কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রতাপ রাওর এক পুত্র শাহুর সেবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সামাজিক হিসাবে বংশ-মর্য্যাদায় আমি আমার রাজার সমকক্ষ। আমিই মুসলমান হইয়া রাজার ধর্ম্ম রক্ষা করিব ; মারাঠাদিগের জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিব ; শিবাজীর বংশের গৌরব অব্যাহত রাখিব। প্রভুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যিনি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বড় ধর্ম্মবীর আর কে আছে ?



জেমিলি কারেরীর নাম হয়ত তোমরা জান না। কেমন করিয়া জানিবে? তিনি ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন প্রায় তুইশত সত্তর বৎসর পূর্ব্বে। তুইশত বৎসরের বেশী হইল তাঁহার পর্য্যটন কাহিনীর ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। তখন তোমাদের দাদামশায়দের দাদামশায়রাও বোধহয় জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সেকালে ইউরোপ হইতে তুই শ্রেণীর লোক ভারতবর্ষে আসিত। একদল আসিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে; আর একদল আসিত চাকুরীর খোঁজে। তুই দলেরই উদ্দেশ্য এক। নিজেদের দেশে পয়সা রোজগার করা সহজ ছিল না, এদেশে তাহারা আসিত কোন রকমে পকেট ভর্ত্তি করিবার জন্য। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা সচ্ছল অবস্থার লোক যে

বেশী ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। নিছক কৌতূহলের বশেও যে কালেভদ্রে দুই-একজন সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মোগল বাদশাহের রাজ্যে না আসিতেন এমন নহে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের দেশের লোকেদের কাছে এই আজব দেশের আজব কাহিনী বলিতে চাহিতেন। তাহার ফলে কয়েকখানি বই লেখা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ফরাসী চিকিৎসক বার্ণিয়ে, রত্নবণিক তাভার্ণিয়ে, ইংরাজ রাজদূত রো, যাজক টেরী এবং ইটালীর ভাগ্যান্বেষী মানুসীর গ্রন্থের আজকাল খুব আদর হইয়াছে। জেমিলি কারেরীও ইটালীর লোক। কোন পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার মন এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি সেই দুঃখ ভুলিবার জন্য দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তুর্কী, মিশর ও পারস্য ঘুরিয়া তিনি দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন। আবার ভারতবর্ষ হইতে চীন ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া মেক্সিকোর পথে তিনি ইটালীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং পথে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া তিনি প্রত্যেক দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার, ইতিহাস প্রভৃতি জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেকালের সাধারণ ভ্রমণকারী অপেক্ষা তিনি ঢের বেশী বিদ্বান ছিলেন। নিজের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর অব সিভিল ল' বা ব্যবহারশাস্ত্রাচার্য্যের উপাধি পাইয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেকালের হিসাবে তিনি রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, অনেক সময়ই

তাঁহাকে শোনা কথার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ সর্ব্বদা নির্ভুল হয় নাই।

পারস্য দেশ হইতে তিনি জলপথে পর্ত্তুগীজদিগের দমন বন্দরে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে সুরাট, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ের জায়গা দেখিয়া তিনি পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান বন্দর গোয়ায় যান। তখন বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে ছিলেন। কারেরীর ইচ্ছা হইল যে, তিনি একবার বাদশাহের শিবির দেখিবেন এবং সম্ভব হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন বাদশাহের সেনাবিভাগে ইটালী ও পর্ত্তুগালের বহুলোক চাকুরী করিত। কারেরী স্বভাবতঃই ইহাদিগকে মুরুব্বী ধরিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের পথঘাট তখন বিশেষ ভাল ছিল না। পথে চোর-ডাকাতের ভয় ত ছিলই কিন্তু শিবাজীদের উপদ্রবেই সাধারণ পথিকেরা বেশী বিপন্ন হইত। কারেরী ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় আসিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যু হইয়াছিল তাহার ১৫ বৎসর আগে—১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তোমাদের মনে হইতে পারে যে তখন শিবাজীদের উপদ্রবের কথা কারেরী কেন লিখিলেন। বিদেশের লোকেরা তখনও মারাঠাদিগের নাম শোনে নাই। শিবাজীর অনুচর বলিয়াই তাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই কারেরীর বিবরণে কোথায়ও মারাঠাদিগের উল্লেখ নাই। তিনি তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন শিবাজীর নামে। বোম্বাইর নিকট একটি ছোট দ্বীপ তখন মারাঠাদিগের দখলে ছিল। কারেরী লিখিতেছেন যে,—এই

দ্বীপে পাহাড়ের উপর একটি কেল্লা আছে, সেখানে শিবাজীদিগের কতকগুলি বাড়ী আছে। এই শিবাজীদের সহিত সর্ব্বদাই মোগল বাদশাহ ও তাঁহার কর্ম্মচারী সিদিদিগের লড়াই চলিতেছে।

মোগল বাদশাহের ইউরোপীয় সিপাহীরা দেশী সৈন্যদিগের অপেক্ষা বেশী বেতন পাইতেন ; কিন্তু কারেরীর বিবরণ পড়িলে তাহারা যে সকলেই খুব সাহসী ছিলেন এমন মনে হয় না। বাদশাহী শিবিরের পথে কারেরীর সহযাত্রী ছিলেন ফ্রান্সিস দা মিরান্দা। তিনি বাদশাহী ফৌজে চাকুরী করিতেন। একদিন কারেরী ও মিরান্দা একটি সতীদাহের খবর পাইয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, সেখানে ভয়ানক গোলযোগ, একজন মুসলমান আর একজনের সহিত ঝগড়া করিয়া নাক কাটিয়া দিয়াছে ; সুতরাং সঙ্গের কুলীরা ভয় পাইয়া তাঁবু ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কারেরীর নিষেধ সত্ত্বেও মিরান্দা কুলীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। মিরান্দার বাবুর্চ্চী ত মনিবের সাহস দেখিয়া অবাক। সে বলিল যে, এই সাহসের জন্য কি বাদশাহ্ ইহাকে দৈনিক দুই টাকা বেতন দেন ? কোথাও দুশমন নাই, এখনই ছুটিয়া পালাইতেছে। যদি শত্রুরা তাড়া করে তবে কি করিবে ?

যাহা হউক মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি কারেরী গলগলায় বাদশাহের শিবিরে পৌঁছিলেন। শিবাজীরা নাকি মাঝে মাঝে বাদশাহী শিবিরের আশে-পাশেও হানা দিত। সুতরাং পথে

যে কারেরীর কোন বিপদ ঘটে নাই তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে বই কি !

বাদশাহের শিবিরে তখন ৬০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ লক্ষ পদাতিক ছিল। তাহাদের জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ৫০ হাজার উট ও ৩ হাজার হাতী প্রয়োজন হইত। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকারের কারিকর ও ব্যবসায়ী যে কত ছিল তাহার সংখ্যাই করা যায় না। শিবিরটিকে একটি চলন্ত সহর বলিলেই হয়। শিবিরের লোকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আড়াই শত বাজার বসিত।

ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের সুপারিশে কারেরী বাদশাহেরও দর্শন পাইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের তখন বয়স হইয়াছে। তিনি একটু খর্ব্বাকৃতি ও শীর্ণকায় ছিলেন। তাঁহার দাড়ি পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সরকারী কাগজপত্র দেখিবার জন্য তাঁহার চশমার প্রয়োজন হইত না। একখানি লাঠি ভর করিয়া তিনি হাঁটিতেন। তিনি নিজ হাতে প্রত্যেক কাগজে সহি করিতেন। কারেরীকে তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, চাকুরীও দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু চীনে যাইবেন বলিয়া তিনি আওরঙ্গজেবের চাকুরী স্বীকার করেন নাই।

কারেরী যে কেবল রাজা বাদশাহের কথা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার গ্রন্থে এদেশের ফল, ফুল, পশু, পাখী প্রভৃতির বিবরণ ও চিত্র আছে। তিনি কতকগুলি বানরের গল্প লিখিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই

কৌতুককর। একটা বানর নাকি নিত্য এক পর্ত্তুগীজ ভদ্রলোকের রসুইখানা হইতে নারিকেল চুরি করিয়া খাইত। বানরটিকে জব্দ করিবার জন্য ভদ্রলোক গন্‌গনে আগুনের উপর একটা নারিকেল রাখিয়া মজা দেখিবার জন্য লুকাইয়া রহিলেন। বানরটা ঘরে ঢুকিয়াই দেখে যে, নারিকেল তুলিতে গেলে হাত পুড়িয়া যায় অথচ অমন ভাল খাবারটা ফেলিয়া যাওয়াও চলে না। সে তখন তাড়াতাড়ি একটা বিড়াল ধরিয়া তাহার হাত দিয়া নারিকেল তুলিয়া লইল। ভদ্রলোক ত ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির।

কারেরী মোগল বাদশাহের রাজ্য, সেনা-বিভাগ, রাজস্ব প্রভৃতির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নহে। চীনে যাইবার পথে তিনি আমাদের বাঙ্গালাদেশেও আসিয়াছিলেন। মোগল রাজ্যে বাঙ্গালাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। এখান হইতে রেশম ও কার্পাস বস্ত্র এবং আরও অনেক জিনিস রপ্তানী হইত।

প্রায় দুই শত বৎসর আগে কারেরীর বইএর ইংরাজী অনুবাদ বিলাতে ছাপা হইয়াছিল। সুতরাং এখন তাঁহার বই খুবই দুষ্প্রাপ্য। বড় হইয়া সুবিধা পাইলে বইখানি পড়িয়া দেখিও; সেকালের ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে।



মরা মানুষের উপদ্রব

মৃত্যুর পর সাধারণতঃ মানুষের উপকার বা অপকার করিবার ক্ষমতা থাকে না। মৃত ব্যক্তি যদি ভূত হইয়া উপদ্রব করে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মরা মানুষ সত্য সত্যই ভূত হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভূত না হইয়াও কখনও কখনও মরা মানুষ উপদ্রব করিতে পারে যদি তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্থ এডোয়ার্ডের দুইটি শিশুপুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়াছিলেন। কখন, কেমন করিয়া তিনি বালক দুটিকে খুন করিয়াছিলেন, কোথায় তাহাদের মৃতদেহ লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, সাধারণ লোকে তাহা জানিত না। কাজেই রাজকুমারদিগের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহারা একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারে নাই। ইহার ফলে অনেকদিন পরে

একজন দুষ্ট লোক কনিষ্ঠ রাজকুমার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া দেশে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল।

তোমরা নিশ্চয়ই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কথা পড়িয়াছ। সেই যুদ্ধে মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও ভাউর মৃত্যু হয়। যুদ্ধের পরে তাঁহার মৃতদেহের সংকার হইয়াছিল। সদাশিব রাও তখনকার পেশবা বালাজী রাওর পিতৃব্য-পুত্র। পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা পক্ষে এত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল যে, সদাশিব রাওর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী খুব বেশী ছিল না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই মারাঠা রাজ্যে একটা জনরব উঠিল যে, প্রকৃতপক্ষে ভাউ সাহেবের মৃত্যু হয় নাই, পরাজয়ের অপমানে তিনি আত্মীয়-স্বজনকে মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার পত্নীর মনে প্রথম অবধিই সদাশিব রাওর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল; এইজন্য তিনি কখনও সধবার চিহ্ন ও আচার ত্যাগ করেন নাই। শেষে মারাঠাদেশে সত্য সত্যই এক নকল ভাউ সাহেব আসিয়া হাজির হইল। তাহার দলে যোগ দিবার লোকেরও অভাব হইল না। অনেক কষ্টে তখনকার মারাঠা কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। লোকটার চেহারার সহিত মৃত ভাউ সাহেবের চেহারার এমন মিল ছিল যে, মারাঠা-প্রধানেরা কখনও তাহাকে ভাউ সাহেবের স্ত্রীর সম্মুখে হাজির করিতে সাহস পান নাই। তাঁহারা তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নকল ভাউ সাহেব এক কনোজিয়া ব্রাহ্মণ, আদৌ মহারাষ্ট্রীয় নহে।

দ্বিতীয় বাজী রাও যখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হন তখন তাঁহার সেনাপতি ছিলেন বাপু গোখলে। গোখলে তখনকার মারাঠা-সেনানায়কদিগের মধ্যে সাহসে ও প্রভু-ভক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। যুদ্ধে নিহত হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, যেহেতু বহু পরিচিত লোকের সম্মুখে তাঁহার মৃতদেহের সৎকার হইয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া বলিতে পারি না কাহারও কাহারও মনে ধারণা হইয়াছিল যে, গোখলে বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার স্ত্রী যমুনা বাঈ মনে করিতেন, গোখলে আরবদেশে লুকাইয়া আছেন। এই বিশ্বাসে তিনি মধ্যে মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ সরকারের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধেও এদেশে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। সিপাহীযুদ্ধের শেষে নানাসাহেব যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিলেন কেহ জানে না। এতদিনে যেখানেই হউক তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী নেপালে জঙ্গ বাহাদুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং নানা সাহেবও বোধহয় নেপালের কাছাকাছি কোথাও লুকাইয়া ছিলেন। তারপর কোথায় কি অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। কানপুরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য নানা সাহেবের প্রতি ইংরাজদিগের খুব রাগ ছিল। নানা সাহেবকে ধরিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এইজন্য মধ্যে মধ্যে অনেক নিরীহ সাধু সন্ন্যাসীকে নানা সাহেব সন্দেহে ধর-পাকড়

করা হইয়াছে। আমাদের ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম যে, নানা সাহেব ভ্রমে পুলিশ একজন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পরিচিত একজন বৃদ্ধ একদিন গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, 'নানা সাহেব কোথায় আছেন জান? রুশতুর্কী যুদ্ধের সময় যে ওসমান পাশা এত বীরত্ব দেখাইয়াছেন তিনিই নানা সাহেব, আর কেহ নহেন। নিজের দেশ হইতে সকলের চক্ষু এড়াইয়া একেবারে তিনি তুর্কীদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।'

সিপাহী যুদ্ধের আর একজন নায়ক সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের প্রদেশের অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা প্রচলিত আছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ভোজপুরী দারওয়ানের সঙ্গে বাবু কুমার সিংহের কথা আলোচনা করিয়াছিলাম। কুমার সিংহের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সে ত হাসিয়াই অস্থির। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামাইয়া সে আমাকে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল যে, 'বাবু কুমার সিংহের মৃত্যু হয় নাই, হইতে পারে না। যেখানেই হউক তিনি তপস্যা করিতেছেন, সময় হইলেই আবার দেখা দিবেন।' সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রায় একশত বৎসর হইতে চলিল, এখনও যদি তাঁহার অনুচরদিগের প্রপৌত্রেরা কুমার সিংহের ফিরিবার আশা করে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে।

নেপোলিয়নের সেনাপতি মার্শাল নে সম্বন্ধেও এইরকমের একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইতিহাসে লেখে নেপোলিয়ান এলবা হইতে ফিরিবার পর নে বিনা আপত্তিতে তাঁহার সঙ্গে

যোগ দেন। এই অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। সৈনিকদিগের রীতি অনুসারে মার্শাল নে'কে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল। ফরাসীদেশে তাঁহার সমাধির উপরে এখনও তাঁহার নাম ও পরিচয় লেখা আছে।

এই বিবরণে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহারা বলেন যে সেনাপতি ওয়েলিংটন ও নে উভয়েই ফ্রি ম্যাসন সম্প্রদায়ের লোক। ওয়েলিংটনের তদ্বিরে নে'র প্রাণদণ্ড রহিত হয়। প্যারিসে যেদিন নে'র প্রাণদণ্ড হইবার কথা তাহার কয়েক সপ্তাহ পরে চার্লস পীটার নে নামক এক ব্যক্তি আমেরিকায় একটি ছোট বন্দরে অবতরণ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, নেপোলিয়নের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নাকি তাঁহাদের মাস্টার মহাশয় ক্লাসের ভিতর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার পরদিন তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এই ছেলেদের অভিভাবক মাস্টার মহাশয়কে তাঁহার বোকামির জন্য তিরস্কার করিলে তিনি বলেন, 'আমার ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা নষ্ট হইয়াছে, প্রাণ রাখিয়া আর লাভ কি?' মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই অজ্ঞাত-পরিচয় শিক্ষক নাকি তাঁহার চিকিৎসকের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনিই বিখ্যাত ফরাসী সেনানায়ক মার্শাল নে।

মরিয়াও তাঁহার অব্যাহতি নাই, নে'র শেষজীবন এখনও আমেরিকা ও ইউরোপের বহু লোকের নিকট এক সমস্যার বিষয়।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে ভূত না হইয়াও মরা মানুষ কি ভাবে জীবিত মানুষের উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হইতে পারে।



ছোট কাজ

অনেক বড়মানুষই ছেলেবেলায় খুব ছোট কাজ করিয়াছেন। খুব সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বড় হইয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন বাল্যকালে রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ ফিরি করিতেন। বিখ্যাত ধনকুবের কার্ণেগী প্রথমে একটা তূলার কারখানার মজুর ছিলেন। ফোর্ড-গাড়ীর কল্যাণে হেনরী ফোর্ডের নামের সহিত সকলেরই পরিচয় আছে। ১৫ বৎসর বয়সের আগে তাঁহার স্কুলে যাইবার সুবিধা হয় নাই। আবার স্কুলে পড়িতে পড়িতেও তিনি খামারের কাজ করিতেন। আসল কথা, কোন কাজই প্রকৃতপক্ষে ছোট নহে। ইঁহারা যখন যে কাজটুকু পাইয়াছেন তাহা খুব ভাল করিয়া করিয়াছেন, সঙ্গে

সঙ্গে নিজের উন্নতির চেষ্টাও করিয়াছেন। সাধারণ কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াই ইঁহারা পরে অসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যখন ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন হয় নাই তখন অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ ছোট ছোট কাজ করিতে করিতে শেষে এক একটা রাজ্যের মালিক পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষ রণোজীও এই শ্রেণীর একজন কৃতী পুরুষ।

রণোজী খুব সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক বনিয়াদী বংশের মত কুন্নেরখেড়ের সিন্ধিয়ারাও গরীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই রণোজী চাকরী করিতে পুণায় চলিয়া গেলেন। সে প্রায় দুইশত বৎসর আগেকার কথা। তখন মারাঠারাই ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রবল। তাহাদিগকে ভারতবর্ষের সকল রাজাই অল্পবিস্তর ভয় করিত। পুণ্যশ্লোক শিবাজীর নাতি শাহু তখন মারাঠাদিগের রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল সাতারা নগরে। তিনি কিন্তু বড় আয়েসী লোক ছিলেন। বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া তিনি সাতারার প্রাসাদে নিশ্চিন্ত আরামে কাল কাটাইতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, ছুটাছুটি-হাঁকাহাঁকি তাঁহার মোটেই ভাল লাগিতনা। তাঁহার কর্ম্মচারীদের মধ্যে পেশবাই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। পেশবা একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির কাজ করিতেন। পেশবার রাজধানী ছিল পুণায়। পুণা এখন মস্ত বড় সহর। কিন্তু পেশবাদের বাড়ীঘর সেখানে আর নাই, সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে

উচ্চাভিলাষী লোকেরা পেশবার নিকট চাকরী করিতে যাইত। মারাঠা-সাম্রাজ্যের তখন বৃদ্ধির সময়; সুতরাং বুদ্ধি থাকিলে সেনাদলে ও দপ্তরখানায় যোগ্যতা দেখাইবার যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যাইত। আর একবার কোন বিষয়ে পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিলে কাহারই উন্নতির বাধা থাকিত না। এই জন্যই রণোজী চাকরীর খোঁজে পুণায় গিয়াছিলেন; আর সাধারণ জায়গীরদারদিগের কাছে না যাইয়া তিনি পেশবার কাছেই চাকরী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সব সময় তো আর বড়লোকের বাড়ীর বড় চাকরী খালি থাকে না; আর থাকিলেই বা অজানা অচেনা মানুষকে কে বড় চাকরী দেয়? সুতরাং রণোজীর ভাগ্যে এমন চাকরী জুটিল যে তাহা লইতে বোধ হয় অনেকেই ইতস্ততঃ করিত। পেশবার জুতা বহিবার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। রণোজী নিঃসংকোচে ঐ কাজ গ্রহণ করিলেন। আর ঐ চাকরীতে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াই তিনি পরে একটি রাজ্যখণ্ডের শাসন-ভার পাইয়াছিলেন।

একদিন পেশবা বাজীরাও ছত্রপতি শাহুর সহিত খুব জরুরী একটা কাজের পরামর্শ করিতে সাতারার প্রাসাদে গিয়াছেন। দরবারের রীতি অনুসারে তিনি ঘরের বাহিরে জুতা রাখিয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন, আর রণোজী জুতার খবরদারী করিতে লাগিলেন। পেশবা রাজার ঘরে ঢুকিয়াছেন বিকালবেলা; রাত দুপুর হইয়া গেল, তবু তাঁহার ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই। এদিকে বেচারা রণোজীর দুইচক্ষু ঘুমে

জড়াইয়া আসিতেছে। দরবার শেষ করিয়া অনেক রাত্রিতে বাজীরাও যখন বাহির হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে তাহার জুতা-বরদার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঘুমের ভিতরও সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলে নাই। দুই হাতে জুতা-দুইখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে। রণোজীর এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া পেশবা এমন খুশী হইলেন যে তিনি তাঁহাকে সেনা-বিভাগে একটি চাকরী দিলেন,—বড় চাকরী নহে, দশজন সিপাহীর নায়েকগিরি। কিন্তু এই চাকরীতেও রণোজী নিজের যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ সেনাপতির পদ ও মস্ত বড় জায়গীর লাভ করিলেন। সেই জায়গীরই পরে গোয়ালিয়র রাজ্যে পরিণত হয়।

সেই স্বাধীনতার যুগে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই এইরূপ ছোট ছোট কাজ করিতে করিতে উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। ইন্দোরের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ মলহার রাও হোলকারের সঙ্গে রণোজীর খুব খাতির ছিল। মলহার রাও ছেলেবেলায় ভেড়া চরাইতেন। তিনি একজন জায়গীরদারের অধীনে সিপাহীগিরি করিয়া এমন নাম করিয়াছিলেন যে পেশবা যাচিয়া তাঁহাকে নিজের সেনাদলে লইয়া গিয়াছিলেন। সাগরের রাজার পূর্ব্বপুরুষও গোড়ায় রাঁধুনী বামুন ছিলেন। বরোদার মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন গরুর রাখাল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—রণোজীর ছেলেরা বাপের ছোট চাকরীর কথা মনে করিয়া লজ্জা পাইতেন কি না? ইহার উত্তর—মোটেই নয়।

সিন্ধিয়া বংশের সব চেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি মহাদজী। মারাঠা-সাম্রাজ্যে সেকালে তাঁহার মত রণ-নিপুণ যোদ্ধা আর ছিল না। দিল্লীর দরবারেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে মালিক ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পেশবার প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে পারিতেন, কিন্তু পেশবা যে তাঁহার বাপের মনিব তাহা তিনি কোনও দিন ভুলিয়া যান নাই। তখনকার পেশবা ছিলেন নাবালক। নানা ফড়নবীশ নামক একজন মন্ত্রী তাঁহার অভিভাবকের কাজ করিতেন। নানার সহিত মহাদজীর খুব আড়াআড়ি ছিল। নানা মহাদজীকে কি করিয়া জব্দ করিবেন তাহার ফিকির খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে তিনি ঠিক করিলেন যে একদিন একটা মস্ত বড় মিছিল বাহির করিতে হইবে। পেশবা হাতীর পিঠে বসিয়া মিছিলের আগে আগে যাইবেন, আর তাঁহার কর্ম্মচারীরা নিজেদের পদমর্য্যাদা অনুসারে পর পর হাঁটিয়া যাইবেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহাদজীর একটা পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নানা ভাবিয়াছিলেন যে মহাদজী আর সকলের সঙ্গে সমান হাঁটিতে না পারিয়া জব্দ হইবেন। প্রস্তাব করিবামাত্রই মহাদজী নানার মতলব বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি তো আর সহজে জব্দ হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন—'ইহা তো খুব ভাল কথা। পেশবা হাতীতে যাইবেন। কর্ম্মচারীরা সকলে হাঁটিয়া যাইবে। কিন্তু পেশবার খাস-চাকরদের তো তাঁহার হাওদার পিছনেই বসিতে হইবে। কখন কি দরকার হয় বলা যায় না তো! আমি জুতা-বওয়া চাকর। আমাকেও হাওদার পিছনেই বসিতে

হইবে।' মহাদজী যত বড়ই বুদ্ধিমান হউন্ না কেন, পিতার প্রথম জীবনের চাকরী সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করিলে নিশ্চয়ই তিনি সে কথার উল্লেখ করিতেন না।

কোন কাজকেই ছোট মনে করিতে নাই। সব কাজই ভাল করিয়া শেখা উচিত। তাহা হইলে রণোজী ও মহাদজীর মত বড় হওয়া অসম্ভব হয় না।

আবু তাবেলার বিচার

আবু তাবেলা কে জান ? তিনি ছিলেন আফ্রিদিদের যম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাইবার গিরিসঙ্কটের কাছে যে বেপরোয়া পাহাড়ী জাতিদের বাস, তাহারা মরণের ভয় মোটেই করে না। ছেলেবেলা হইতেই তাহারা লুটপাট যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে অভ্যস্ত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার দখল করিবার পর খাইবারের এই আফ্রিদিদের লইয়া ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখনও সন্ধ্যার পর পেশোয়ারের সকল ফটক বন্ধ হইয়া যায় ; বাহির হইতে কেহ সহরে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং সহজেই অনুমান করিতে পার যে, আরও শ'খানেক বছর আগে ওখানে এই পাহাড়ীদের কিরূপ উপদ্রব ছিল !

রণজিৎ সিংহের একজন খুব বড় সেনাপতি ছিলেন হরিসিংহ নালুয়া। পেশোয়ার শাসন করিবার ভার প্রথম তাঁহার

হাতেই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ওখানকার পাহাড়ীদিগকে এমন শাসনে রাখিয়াছিলেন যে, আজও সীমান্তের পাঠান-জননীরা তাহাদের দুরন্ত ছেলেদের "ঐ নালুয়া আসিতেছে" বলিয়া ভয় দেখায়। হরি সিংহের মৃত্যুর পর শিখ সর্দ্দারেরা যখন সীমান্তের উপজাতিদের উৎপাত দমন করিতে পারিলেন না, তখন আবু তাবেলার ডাক পড়িল। আবু তাবেলা কিন্তু এদেশের লোক নন। তাঁহার আসল নাম আভিতাবিল, বাড়ী ছিল ইটালীর নেপলস অঞ্চলে। নেপোলিয়নের সেনাদলে তাঁহার যুদ্ধে হাতেখড়ি হয়। তারপর যুদ্ধ থামিয়া গেলে কিছুদিন তিনি আধা মাহিনায় বেকার হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মত লোক ত আর বেশীদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। শেষে রোজগারের ভরসায় কয়েকখানা সুপারিশ পত্র যোগাড় করিয়া তিনি ইরাণ দেশে গিয়া হাজির হইলেন। সেখানকার সেনাদলে তিনি খুব একটা বড় চাকুরী পাইয়াছিলেন। বছর দুয়েক ইরাণে থাকিয়া তিনি আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু দেশে বেশীদিন তাঁহার মন টিকিল না। সুতরাং আবার বিদেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। এবার আর ইরাণ নয়, ইরাণ ও আফগানিস্থানের হাঁটাপথ পার হইয়া একেবারে লাহোরে রণজিৎ সিংহের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের রাজ্যে বিদেশী সেনাপতিদের তখন খুব আদর ছিল। তিনি তাঁহার সিপাহীদিগকে ইউরোপীয় কায়দায় লড়াই শিখাইতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই অনেক ফরাসী, ইটালীয়ান ও ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহার সেনাবিভাগে

চাকুরী পাইয়াছিল। আভিতাবিলের অল্পদিনের মধ্যেই খুব উন্নতি হইল এবং সেনা-বিভাগ হইতে তিনি শাসন-বিভাগে বদলী হইয়া গেলেন। প্রথম তাঁহাকে উজিরাবাদের শাসনভার দেওয়া হইয়াছিল। তারপর হরিসিংহের মৃত্যুর পর শিখ সর্দ্দারেরা যখন আফ্রিদিদের ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলেন না, তখন আভিতাবিলকে সেখানে পাঠান হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই ওখানকার গুণ্ডা বদমায়েসেরা বুঝিতে পারিল যে আবু তাবেলা যতদিন পেশোয়ারে থাকিবেন, ততদিন সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। তাঁহার কড়া শাসনে চোর-ডাকাতেরা এমন সায়েস্তা হইয়া গেল যে, রাস্তার কাছে বেওয়ারিস মাল পড়িয়া থাকিলেও কেহ তাহাতে হাত দিতে সাহস করিত না। চোর-ডাকাতদের ধরিয়া ফাঁসি দিতে একটুও দেরী হইত না। কান কাটা, নাক কাটা, হাত কাটা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাজা দিয়া মানুষকে ভয় দেখান যায়, খুশী রাখা যায় না। তাহার জন্য চাই সুবিচার—সুবিচারক বলিয়াও আবু তাবেলার খুব সুখ্যাতি ছিল। একটা শক্ত মামলার তিনি কিরূপ সহজ মীমাংসা করিয়াছিলেন, এইখানে সেই গল্প বলিতেছি।

মামলাটা হইয়াছিল ছেলে লইয়া। এখন যেখানে পেশোয়ারের পুলিশের বড় কোতোয়ালি সেইখানে আবু তাবেলা থাকিতেন। তাঁহার দোতলার উপর হইতে লোহার শিকল দিয়া একটা কাঠের বাক্স রাস্তায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। সেই বাক্সে কোন দরখাস্ত ফেলিয়া দিলেই আবু তাবেলার হাতে

পৌঁছিত। সুতরাং গরীব লোকেরাও বিনা বাধায় তাঁহার কাছারীতে উপস্থিত হইতে পারিত। একদিন দুইটি স্ত্রীলোক দুইটি শিশু লইয়া সেই কাছারীতে হাজির। শিশু দুইটির মধ্যে একটি ছেলে একটি মেয়ে। দুইটি স্ত্রীলোকই কিন্তু ছেলেটিকে নিজের সন্তান বলিয়া দাবী করিতেছিল। সাক্ষী নাই, কি করিয়া স্থির করা যাইবে কোন শিশুটি কোন্ মায়ের সন্তান। তোমরা সলোমনের গল্প পড়িয়াছ। সে মামলায় দুই মা একটি ছেলেকে নিজের বলিয়া বিচারের দাবী করিয়াছিল। সুতরাং সলোমন দুইভাগ করিয়া কাটিবার প্রস্তাব করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন কাহার দাবী মিথ্যা। এবারে মামলার বিষয় দুইটি শিশু। সুতরাং কাটিয়া ভাগ করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আবু তাবেলা কি করিলেন জান? তিনি কাছারী ঘরে দুইটি বাচ্চা সমেত একজোড়া মহিষ, একজোড়া গাই এবং একজোড়া ছাগল আনাইলেন। ছয়টা বাচ্চার তিনটা মাদী, তিনটা মরদ। আবু তাবেলা সকলের সামনে গাই মহিষ ও ছাগলের দুধ দোহাইলেন। তারপরে দুধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে মাদী বাচ্চাদের মায়ের দুধ মরদ বাচ্চাদের মায়ের দুধের চেয়ে নিকৃষ্ট। গাই, মহিষ ও ছাগলদের দুধ পরীক্ষার পর বাদিনী ও প্রতিবাদিনীর স্তন্যের তারতম্য পরীক্ষা করা হইল। যাহার স্তন্য বেশী ঘন হইল, আবু তাবেলার বিচারে সেই ব্যাটা ছেলের মা বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

আজকালকার আদালতে এই রকম বিচার চলিবে কি?



সেকালে ইউরোপের সকল প্রদেশের লোকদিগকেই হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা ফিরিঙ্গি বলিত। ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্ত্তুগীজ, ইটালীয়ান, স্প্যানিস—তখনকার হিসাবে সকলেই ফিরিঙ্গি। ভারতবর্ষে ধনদৌলতের তখন নাকি অভাব ছিল না; বিদেশী লোকেদের ধারণা ছিল যে, এখানকার পথের ধূলায়ও সুবর্ণরেণু থাকে। তাই অর্থলাভের আশায় সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বহু ফিরিঙ্গি ভারতবর্ষে আসিত।

আমাদের দেশের লোকেরা তোপখানার কাজে তেমন নিপুণ ছিল না বলিয়াই তখনকার রাজা বাদশাহেরা ফিরিঙ্গি-স্থান হইতে আগত এই ভাগ্যান্বেষীদের মোটা মাহিনায়

সেনাবিভাগে চাকুরী দিতেন। দিল্লীর বাদশাহ্, অযোধ্যার নবাব, হায়দরাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, পুণার পেশবা, মহীশূরের মুসলমান স্থলতান—সকলের ফৌজেই দুই-চারিজন ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী দেখা যাইত।

পাঞ্জাব-কেশরী রণজিতের ফৌজেও অনেক ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী ছিল। আলার্ড, কোর্ট, আভিতাবিল, ভেন্তুরা প্রভৃতি সেনাপতিগণ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। লাহোর দরবারে তাঁহাদের অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আবার এক একটা প্রদেশের শাসনভারও তাঁহাদের হাতে অর্পিত হইত। এই ভাবে রণজিতের রাজ্যে ফরাসী, ইংরাজ, ইটালীয়ান, স্প্যানিস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বহু কর্ম্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের স্থখ-সৌভাগ্যের সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় বহু ফিরিঙ্গি স্থপারিস-পত্রসহ পাঞ্জাবে আসিত ; ডাঃ হনিগ্‌বার্গার ইহাদের অন্যতম। তাঁহার পেশা চিকিৎসা, নিবাস ট্রানস্‌সিলভেনিয়া। স্থলপথে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি লাহোরে উপস্থিত হন।

ডাক্তার সাহেব সেনাপতি কোর্ট ও আভিতাবিলের নিকট স্থপারিস-পত্র আনিয়াছিলেন, এবং রণজিতের সরকারে চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিছুদিন পাঞ্জাবে থাকিবার পর তিনি স্বদেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার একজন মুরুব্বি বলিয়াছিলেন—'রণজিতের রাজ্যে বিদেশী লোকের চাকুরী পাওয়া বড়ই কঠিন, কিন্তু ছুটি পাওয়া আরও শক্ত।' হনিগ্-বার্গারের চাকুরী পাইতেও কষ্ট হয় নাই, ছুটিও তিনি

পাইয়াছিলেন। তিনি তুর্কীদেশ দিয়া সিরিয়া ও ইরাণের পথে ভারতে আসিয়াছিলেন। বাগদাদ হইতে লাহোর পৌঁছিতে তাঁহার পাকা চারিমাস লাগিয়াছিল। দেশে ফিরিবার সময় তিনি আফগানিস্থান ও রুশিয়ার পথ ধরিলেন। এই পথে বিপদ ও অসুবিধার অন্ত ছিল না। কিন্তু অজ্ঞাতকে জানিবার ও দুর্গমকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা বোধ হয় মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। অজানা দেশে যিনি প্রাণ হাতে করিয়া আসিয়াছিলেন, দেশের ডাকে যে তিনি কোন বিপদই গ্রাহ্য করিবেন না তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানর আনন্দ যে একবার অনুভব করিয়াছে জন্মভূমিতে বেশীদিন চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই কিছুদিন পরেই হনিগ্‌বার্গার আবার তল্পিতল্পা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি আগে ছিলেন অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার, এবার নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় উপকার পাইয়া হ্যানিমানের চেলা হইলেন। পথে এক জায়গায় তিনি সেনাপতি ভেন্তুরার নিকট খবর পাইলেন যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের বড় অসুখ। ভেন্তুরা ভারতবর্ষে যাইতেছেন, হনিগ্‌বার্গারও যেন কালবিলম্ব না করিয়া লাহোর যাত্রা করেন। এই খবর পাইয়া ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ লাহোর রওনা হইলেন। তাঁহার চিকিৎসায় রণজিতের রোগের কিছু উপশম হইয়াছিল। মহারাজা খুসি হইয়া তাঁহার হাতে একজোড়া সোনার বালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন পরে মহারাজার জ্বর বৃদ্ধি হইলে

তাঁহার দেশী চিকিৎসকেরা ফিরিঙ্গি ডাক্তারের ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে পাঞ্জাব-কেশরী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার কিন্তু পাঞ্জাব ইংরাজদিগের দখলে আসা পর্য্যন্ত এদেশেই রহিয়া গেলেন। রণজিতের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে যে অরাজকতা হইয়াছিল তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মহারাজা খরক সিংহের মৃত্যু ও তাঁহার পুত্র নওনিহাল সিংহের (রণজিতের পুত্র ও পৌত্র) অপমৃত্যুর দিন তিনি লাহোরে উপস্থিত ছিলেন। শেরসিংহের হত্যাকালেও তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন এবং তাহার পাঁচমিনিট পূর্ব্বে হতভাগ্য রাজার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। তারপর নানা বিপ্লবের পর ইংরাজেরা যখন পাঞ্জাব দখল করিলেন, তখন রণজিতের ফিরিঙ্গী চিকিৎসকও পেন্সন লইয়া ফিরিঙ্গীস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

হনিগ্‌বার্গার প্রায় ত্রিশ বৎসর প্রাচ্যদেশে ছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি যাহা দেখিয়া ও শুনিয়াছিলেন, অবসর কালে তাঁহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি চিকিৎসক, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে চিকিৎসা ও ঔষধের কথাই বেশী পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও আফগানিস্থান হইতে তিনি কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ ভিয়েনায় লইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উদ্ভিদ সম্বন্ধেও তাঁহার গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। সে সকল তোমরা বড় হইয়া পড়িও। আজ হনিগ্‌বার্গারের গ্রন্থ হইতে তোমাদিগকে গোটাকয়েক গল্প বলিব।

হনিগ্‌বার্গার বলেন যে, রণজিৎ সিংহ বড়ই কদাকার ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে পাঁচটা প্রকাণ্ড ঘোড়া

উপহার দিয়াছিলেন। রণজিৎ ইহার একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন ; কিন্তু তিনি এতই খর্ব্বকায় ছিলেন যে, ঐ প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিলে তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আসীন মর্কটের ন্যায় দেখাইত।

রণজিৎ চিরকাল মানুষ চরাইয়াছেন। মানুষ চিনিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ; কিন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ জ্যাকমঁকে তিনি কাশ্মীরের শাসনভার দিতে চাহিয়াছিলেন। হনিগ্‌বার্গারও ইচ্ছা করিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ পাইতে পারিতেন ; কিন্তু নিজের যোগ্যতায় তেমন বিশ্বাস না থাকায় মহারাজার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। একজন আমেরিকানের নিকট তীক্ষ্ণবুদ্ধি রণজিৎকে ভয়ানক ঠকিতে হইয়াছিল। ডাঃ এলেন নামক একজন আমেরিকাবাসী রণজিতের অনুগ্রহে গুজরাটের শাসনভার পাইয়াছিলেন। হনিগ্‌বার্গার মহারাজার স্বমুখে শুনিয়াছিলেন যে, গুজরাটের এলেন সাহেব অন্য ধাতুকে সোনা বানাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছেন। হনিগ্‌বার্গারও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন, সুতরাং সোনা বানাইবার চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন নাই। পরে দেখা গিয়াছিল যে, এলেন সাহেবের রাসায়নিক পরীক্ষাগার মেকি টাকা বানাইবার কারখানা ভিন্ন আর কিছু নহে।

সেনাপতি আভিতাবিল উজিরাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হনিগ্‌বার্গার কিছুদিন তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ডাক্তার

যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন সেনাপতির তখন মৃত্যু হইয়াছে। একে নিমক খাইয়াছেন, তাহাতে আবার মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই, সুতরাং হনিগ্‌বার্গার অল্পকথায় আভিতাবিল সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। আভিতাবিল মুসোলিনীর দেশের লোক। শিখ সরকারের চাকুরী হইতে অবসর লইয়া তিনি নেপল্‌সে গমন করেন। সেইখানে অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়; অন্ততঃ হনিগ্‌বার্গারের তাহাই বিশ্বাস। আভিতাবিল অত্যন্ত বদমেজাজী লোক ছিলেন; কাহাকেও ফাঁসি দিতে পারিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। বোধ হয় তাঁহার মস্তিষ্কও একটু বিকৃত হইয়াছিল। একবার অতি সামান্য অপরাধে কয়েকজন মুসলমানের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রণজিৎ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই মুসলমানেরা মনে করিয়াছিল ফিরিঙ্গীর শাসিত জায়গায় গোহত্যা অপরাধের নহে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য আভিতাবিল তাহাদিগকে ফাঁসি দিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিবার পূর্ব্বে আভিতাবিল অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় তিনি কাবুল-যাত্রী ইংরাজদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

রণজিৎ নিজে শিখ হইলেও তাঁহার প্রধান কর্মচারীদিগের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। ফকির নুরুদ্দীন ও তাঁহার ভ্রাতা আজিজুদ্দীনের পরামর্শ না লইয়া মহারাজ কোন কাজ করিতেন না। সেনাপতি ও সচিবদিগের মধ্যে কাশ্মীরের রাজপুত রাজা গোলাব সিংহ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধ্যান সিংহ,

দীননাথ ও মিশির বলিরামের নাম উল্লেখযোগ্য। রণজিৎ অনেক হিন্দু আচার মানিয়া চলিতেন। তিনি অনেকবার গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শিখ ও ব্রাহ্মণেরা যেমন স্ব স্ব শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, মুসলমানেরাও তেমনই আল্লার নাম করিয়াছিলেন। হিন্দুরীতি অনুসারে রণজিতের সহিত তাঁহার কয়েকজন রাণী ও দাসী সহমৃতা হইয়াছিলেন। হনিগ্‌বার্গার লিখিয়াছেন যে, প্রভুর শোকে আত্মহারা হইয়া রাজা ধ্যান সিংহও রণজিতের চিতায় দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পুরুষের পক্ষে এরূপভাবে আত্মহত্যা করার নিয়ম বোধ হয় এদেশে কখনও প্রচলিত ছিল না। সুচতুর ধ্যান সিংহ লোক দেখান শোকের অভিনয় করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হনিগ্‌বার্গারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল বলিয়াই তিনি সেরূপ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

হনিগ্‌বার্গার তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ ভাগে একজন হিন্দু সাধুর অসাধারণ ক্ষমতার কথা লিখিয়াছেন। এই সাধুর নাম হরিদাস। হনিগ্‌বার্গার তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা সেনাপতি ভেন্তুরার মুখে শুনিয়াছিলেন। রণজিৎ নাকি শুনিয়াছিলেন যে, সাধু হরিদাস শ্বাসরোধ করিয়া মৃতকল্প অবস্থায় থাকিতে পারেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না। রণজিৎ এই প্রবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য হরিদাসকে লাহোরে লইয়া আসেন। সাধু শ্বাসরোধ করিবার পর

তাঁহার দেহ একখণ্ড বস্ত্রে জড়াইয়া তাহার উপর শিলমোহর করা হয়। তারপর তাঁহাকে একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাজা নিজের হাতে তাহার তালা বন্ধ করেন। ইহার পরে সেই সিন্দুকটি মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর শস্য রোপণ করা হইল। এই জায়গার চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াই রাজা ক্ষান্ত হন নাই, দিনরাত্রি প্রহরীর ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। চল্লিশদিন পরে যখন সিন্দুক হইতে সাধুর দেহ বাহির করা হয়, সেনাপতি ভেন্তুরা, কয়েকজন ইংরাজ ও রণজিতের দরবারের অনেক পদস্থ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই চল্লিশ দিনে সাধু হরিদাসের দেহের কোনপ্রকার বিকার হয় নাই। হাত পা খুলিবার কিছুক্ষণ পর সাধুর জ্ঞান সঞ্চার হয়। রাজা ধ্যান সিংহ হনিগ্‌বার্গারকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার এই সাধুকে চারি মাস কাল মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন।

আরও অনেক সমসাময়িক বিদেশী গ্রন্থকার রণজিৎ ও তাঁহার রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সে সকল পড়িলে তোমরা এই ক্ষণজন্মা শিখবীর ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে।



নেপালের গুর্খাদের মত এমন বেপরোয়া সিপাহী এদেশে কেন, পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তাদের দেশ ত বনজঙ্গলে ভরা, তাই বাঘ-ভালুকের মত বড় বড় জানোয়ারেরা ওদের পড়শী বলিলেই হয়। পড়শীতে পড়শীতে যে বেশী সদ্ভাব আছে তাও বলা যায় না। কিন্তু গুর্খারা এই সব জানোয়ারের তোয়াক্কাই রাখে না। পথ চলিতে চলিতে বাঘের সঙ্গে যদি মোলাকাত হয়, কোমর হইতে ভোজালি বাহির করিয়া দাঁড়াইলেই হইল। তারপর এক ঘায়ে না হউক দু-তিন ঘায়ে বাঘের দফা শেষ। এই অসমসাহসী জাতির নেতা ছিলেন জঙ্গ বাহাদুর। তখন নেপালের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা

সেখানকার প্রধান মন্ত্রী। অল্প দিন আগেও জঙ্গ বাহাদুরের আত্মীয়েরা নেপাল শাসন করিতেন।

জঙ্গ বাহাদুরের মা ছিলেন নেপালের বিখ্যাত মন্ত্রী ভীমসেনের ভাইঝি। তাঁহার মামাও এক সময়ে নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মাতুল বংশের খাতিরে নেপালের সেনাদলে অল্প বয়সেই তিনি একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যবিভাগের কড়া নিয়ম জঙ্গ বাহাদুরের মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি মধ্যে মধ্যে ফৌজী আইন অমান্য করিয়া শিকারে চলিয়া যাইতেন। শেষে একবার তিনি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন লাহোরে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ তখন শিখদের রাজা। জঙ্গ বাহাদুরের ভরসা ছিল যে, রণজিতের দরবারে তাঁহার মত দুঃসাহসী বীরের নিশ্চয়ই আদর হইবে। কিন্তু তাহা হইল না; হয় এই গুর্খা যুবকের চাল-চলন রণজিতের ভাল লাগে নাই, না হয়ত তিনি ইঁহার গুণের পরিচয় পান নাই। টাকা পয়সা সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুর চিরকালই বেহিসাবী ছিলেন। লাহোরে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি দেখিলেন যে, পয়সাকড়ি সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের ভয়-ডর মোটেই ছিল না। যেমন একদিন ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া লাহোরে আসিয়াছিলেন, তেমনই নির্ভাবনায় দেশে ফিরিয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইজন্য তাঁহার কোন সাজা হয় নাই।

নেপালে তখন ভয়ানক অশান্তি। রাজা ছিলেন একেবারে দুর্ব্বল। দুই রাণীর মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না। তাঁহারা

নিজের নিজের পক্ষের লোকদের মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। দরবারে অনেকগুলি দল ছিল। ইহাদের চক্রান্তে আজ যিনি মন্ত্রী হইতেন, কাল তাঁহার প্রাণ যাইত। এই সময় দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য বাস্তবিকই একজন শক্ত লোকের দরকার ছিল। সুতরাং কয়েক বৎসর পরে জঙ্গ বাহাদুরই হইলেন রাজ্যের কর্ত্তা। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী হইবার আগে তাঁহাকে বেপরোয়াভাবে তরোয়াল চালাইতে হইয়াছে। কিন্তু গুর্খাদিগের মধ্যে তাঁহার মত দুঃসাহসী বোধ হয় আর কেহ ছিল না। তাই সিপাহীরা তাঁহাকে ভালবাসিত, সেনাপতিরা তাঁহাকে ভয় করিত। এখন তাঁহার দুঃসাহসের গোটাকয়েক গল্প বলিব।

বর্ষাকালে নেপালের নদীগুলিতে স্রোতের বড় জোর হয়। তখন নদীতে পড়িয়া গেলে আর রক্ষা নাই। স্রোতের তোড়ে পাথরের পর পাথরে আছাড় খাইয়া খাইয়া মানুষ কেন বড় বড় জানোয়ারেরও বোধ হয় হাড়গোড় গুঁড়া হইয়া যায়। এই সকল নদীর উপর কিন্তু ভাল পুল থাকে না। কখনও একটা কখনও বা দুইটা বেশ শক্ত দেখিয়া গাছ নদীর উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই গাছের উপর দিয়াই নেপালীরা নদী পারাপার হয়। একদিন রাজকুমার সুরেন্দ্র বিক্রমের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে জঙ্গ বাহাদুর এই রকম একটা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজপুত্র তাঁহাকে নদী পার হইতে হুকুম দিলেন। জঙ্গ বাহাদুর ছিলেন ঘোড়ার পিঠে। সাবধানে পায়ে হাঁটিয়া সেই সরু পুল পার হওয়া কঠিন,

কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর একটুও দ্বিধা না করিয়া তাহার উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গিয়াছেন এমন সময় রাজপুত্রের হুকুম হইল, এইবার ফিরিয়া আইস। জঙ্গ বাহাদুর ঘোড়া ঘুরাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভাগ্যে ঘোড়া ও সওয়ার উভয়েই ছিল সমান ওস্তাদ, ঘোড়ার পা একটু ফসকাইলে বা সওয়ার একটু বেসামাল হইলে, সেদিন আর জঙ্গ বাহাদুরের রক্ষা থাকিত না। তিনি বুঝিলেন, রাজকুমার তাঁহার মৃত্যু চান, তাহা না হইলে এমন অসম্ভব আদেশ করিতেন না। সেই দিন হইতেই জঙ্গ বাহাদুর সাবধান হইয়া গেলেন।

পাহাড়ের কূয়াগুলি হয় খুব গভীর। রাজকুমার সুরেন্দ্র-বিক্রমের যাহার উপর রাগ হইত তাহাকেই হাত-পা ধরিয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হুকুম দিতেন। জঙ্গ বাহাদুর অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেও এইরূপ আদেশ হইতে বেশী দেরী নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মত জোয়ান লোক কূয়ায় পড়িয়াও দশ-বারো ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং তিনি একরকম প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। শেষে যেদিন কূয়ায় ফেলিবার হুকুম হইল, তিনি বলিলেন, আমি নিজেই লাফ দিয়া পড়িতেছি—কষ্ট করিয়া ফেলিবার আর দরকার কি? ঝুপ করিয়া শব্দ হইল। রাজকুমার এবং তাঁহার অনুচরেরা মনে করিলেন—আপদ গেল! জঙ্গ বাহাদুর কিন্তু কূয়ার নীচে পাথর ধরিয়া ঝুলিয়া ছিলেন। পরদিন তাঁহার বিশ্বাসী অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে

গোপনে তুলিয়া লইয়া গেল। ইহার পর জঙ্গ বাহাদুর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়াছিলেন।

একবার কাটামুণ্ডুর একটা নরহাতী ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। হাতী ক্ষেপিবার লক্ষণ দেখিলেই মাহুতেরা চারিপায়ে মোটা মোটা লোহার শিকল বাঁধিয়া দেয়। মাস দুই পরে হাতী ঠাণ্ডা হইয়া গেলে আবার শিকল খুলিয়া ফেলে। এই হাতীটা কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া মাহুতকে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর তাহাকে আটকায় কে? নির্ভয়ে মাঠে পড়িয়া ফসল খায়, আর গ্রামে ঢুকিয়া ঘরবাড়ী চূরমার করিয়া দেয়। মানুষ সামনে পড়িলে ত আর কথাই নাই—একটি আছাড়েই শেষ। জঙ্গ বাহাদুর দেখিলেন যে, হাতীটার একটা ব্যবস্থা না করিলে আর চলে না। হাতীটা রোজ একটা ভুট্টার ক্ষেতে পাকা ভুট্টা খাইতে যাইত। জঙ্গ বাহাদুর পথের ধারে একটা গাছের ডালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর গজরাজ যেমন সেইপথে আসিয়াছেন অমনি এক লাফে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া পাগড়ীর কাপড়ে তাহার খুদে চোখ দুইটিকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। তারপর হাতীতে মানুষে সে কি ধস্তাধস্তি তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। ইহারই মধ্যে মাহুতেরা আসিয়া এক সুযোগে হাতীর পায়ে শিকল লাগাইয়া দিল। জঙ্গ বাহাদুর নিরাপদে হাতীর পিঠ হইতে নামিয়া আসিলেন। হাতীও বাঁচিল, আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরাও তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

জঙ্গ বাহাদুর যে কেবল দুঃসাহসের কাজই করিয়া গিয়াছেন

কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর একটুও দ্বিধা না করিয়া তাহার উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গিয়াছেন এমন সময় রাজপুত্রের হুকুম হইল, এইবার ফিরিয়া আইস। জঙ্গ বাহাদুর ঘোড়া ঘুরাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভাগ্যে ঘোড়া ও সওয়ার উভয়েই ছিল সমান ওস্তাদ, ঘোড়ার পা একটু ফসকাইলে বা সওয়ার একটু বেসামাল হইলে, সেদিন আর জঙ্গ বাহাদুরের রক্ষা থাকিত না। তিনি বুঝিলেন, রাজকুমার তাঁহার মৃত্যু চান, তাহা না হইলে এমন অসম্ভব আদেশ করিতেন না। সেই দিন হইতেই জঙ্গ বাহাদুর সাবধান হইয়া গেলেন।

পাহাড়ের কূয়াগুলি হয় খুব গভীর। রাজকুমার সুরেন্দ্র-বিক্রমের যাহার উপর রাগ হইত তাহাকেই হাত-পা ধরিয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হুকুম দিতেন। জঙ্গ বাহাদুর অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেও এইরূপ আদেশ হইতে বেশী দেরী নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মত জোয়ান লোক কূয়ায় পড়িয়াও দশ-বারো ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং তিনি একরকম প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। শেষে যেদিন কূয়ায় ফেলিবার হুকুম হইল, তিনি বলিলেন, আমি নিজেই লাফ দিয়া পড়িতেছি—কষ্ট করিয়া ফেলিবার আর দরকার কি? ঝুপ করিয়া শব্দ হইল। রাজকুমার এবং তাঁহার অনুচরেরা মনে করিলেন—আপদ গেল! জঙ্গ বাহাদুর কিন্তু কূয়ার নীচে পাথর ধরিয়া ঝুলিয়া ছিলেন। পরদিন তাঁহার বিশ্বাসী অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে

গোপনে তুলিয়া লইয়া গেল। ইহার পর জঙ্গ বাহাদুর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়াছিলেন।

একবার কাটামুণ্ডুর একটা নরহাতী ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। হাতী ক্ষেপিবার লক্ষণ দেখিলেই মাহুতেরা চারিপায়ে মোটা মোটা লোহার শিকল বাঁধিয়া দেয়। মাস দুই পরে হাতী ঠাণ্ডা হইয়া গেলে আবার শিকল খুলিয়া ফেলে। এই হাতীটা কিন্তু হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া মাহুতকে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর তাহাকে আটকায় কে? নির্ভয়ে মাঠে পড়িয়া ফসল খায়, আর গ্রামে ঢুকিয়া ঘরবাড়ী চূরমার করিয়া দেয়। মানুষ সামনে পড়িলে ত আর কথাই নাই—একটি আছাড়েই শেষ। জঙ্গ বাহাদুর দেখিলেন যে, হাতীটার একটা ব্যবস্থা না করিলে আর চলে না। হাতীটা রোজ একটা ভুট্টার ক্ষেতে পাকা ভুট্টা খাইতে যাইত। জঙ্গ বাহাদুর পথের ধারে একটা গাছের ডালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর গজরাজ যেমন সেইপথে আসিয়াছেন অমনি এক লাফে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া পাগড়ীর কাপড়ে তাহার খুদে চোখ দুইটিকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। তারপর হাতীতে মানুষে সে কি ধস্তাধস্তি তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। ইহারই মধ্যে মাহুতেরা আসিয়া এক সুযোগে হাতীর পায়ে শিকল লাগাইয়া দিল। জঙ্গ বাহাদুর নিরাপদে হাতীর পিঠ হইতে নামিয়া আসিলেন। হাতীও বাঁচিল, আশেপাশের গাঁয়ের লোকেরাও তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল।

জঙ্গ বাহাদুর যে কেবল দুঃসাহসের কাজই করিয়া গিয়াছেন

তাহা নহে। তাঁহার মত বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা নেপালে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নেপালের বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছেন। লেখাপড়া তিনি জানিতেন না ; কিন্তু কোন রকম সংস্কারের শাসনও তিনি মানিতেন না। উপস্থিত জবাব দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। একবার তিনি বিলাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে গান শুনিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার একজন বিখ্যাত গায়িকা গান শেষ করিবামাত্র জঙ্গ বাহাদুর উল্লাসের সহিত করতালি সহকারে তাহাকে বাহবা দিতে লাগিলেন। ভিক্টোরিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আপনি ত বাহবা দিতেছেন, গানের ভাষা কি আপনি বুঝিয়াছেন? জঙ্গ বাহাদুর একটুও অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর দিলেন—না মহারাণী। গানের ভাষা আমি বুঝি নাই, কিন্তু নাইটিঙ্গেল পাখীর ভাষাও ত আমার জানা নাই।



বাঙ্গালার বাঘ

দেশবিদেশে ৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "বাঙ্গালার বাঘ" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি যেমন তেজস্বী তেমনই নির্ভীক ছিলেন ; তাই লোকে বাঘের সঙ্গে তাঁহার তুলনা দিত। তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও ছিল অসামান্য। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলর, এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধ্যক্ষ এবং যাতুঘরের পরিচালক সভার সভাপতির কার্য্য একই সময়ে করিয়া গিয়াছেন। অথচ এতগুলি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে তাঁহার কখনও কোন ত্রুটি হয় নাই। ভোরে চারিটার সময় উঠিয়া তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন,

আর রাত্রি দশটার সময় তাঁহার বিশ্রাম গ্রহণের অবসর ঘটিত। ইহার মধ্যেই আবার তিনি প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশটি অনুগ্রহ-প্রার্থীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিতেন।

তাঁহার মত পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান সচরাচর দেখা যায় না। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন স্যার আশুতোষের গুণের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, স্যার আশুতোষ একবার বিলাতে যান। স্যার আশুতোষের জননী কিন্তু সমুদ্রযাত্রার বিরোধী ছিলেন, তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে অতদূরে বিদেশে যাইতে দিতে একান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। জননীর অমতের কথা জানাইলে লাট সাহেব বলিলেন যে, 'তোমার মাতাকে বলিও যে, ভারতের রাজপ্রতিনিধির ইচ্ছা যে তুমি বিলাত যাও।' আশুতোষ তখনই উত্তর দিলেন যে, 'তাহা হইলে আমি আমার মায়ের তরফে জবাব দিতেছি যে, তাঁহার পুত্রের নিকট মাতার ইচ্ছা—মাতার আদেশের অপেক্ষা আর কাহারও আদেশ অধিকতর প্রতিপালনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না।'

সাধারণতঃ বড় মানুষের সহিত দেখা করা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আশুতোষের গৃহের দরজা সকলের নিকট অবারিত ছিল। বিশেষতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের ত কথাই নাই। সিটি কলেজ হোষ্টেলের ছাত্ররা একবার যখন সরস্বতী পূজা করিবার অনুমতি পাইল না, তখন আশুতোষ নিজের বাড়ীতে তাহাদিগকে সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

অতি সামান্য ভৃত্যের সঙ্গেও তিনি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণভৃত্য একজন কেরাণীর প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল—'বাবু, আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। আপনার বিদ্যা আছে তাই কেদারা পাইয়াছেন, আমার বিদ্যা নাই, কেদারা পাই নাই। কিন্তু আপনি আমার সহিত অমন ব্যবহার কেন করেন ? জজ সাহেব ত কই কোনদিন আমাকে কোন কটু কথা বলেন নাই। তিনি আমাকে তাঁহার জাতভাই বলিয়া স্নেহ করেন। তাই ভগবান তাঁহাকে এত বড় করিয়াছেন।' বাস্তবিক তাঁহার অধীনস্থ শত শত কর্ম্মচারীর সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার সন্ধান তিনি যেমন রাখিতেন—এমন আর কেহ রাখিতেন না।

এইবার তাঁহার তেজস্বিতার একটা গল্প বলিব। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার বেশভূষার মোটেই আড়ম্বর ছিল না। সামান্য ধুতি পরিয়া চটি পায়ে দিয়া তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। একবার তিনি রেলে কোথায় যাইতেছেন। তাঁহার কামরায় আসিয়া উঠিল সমর-বিভাগের এক সাহেব। দুই একজন ইংরেজ বাঙ্গালীদের পোষাক-পরিচ্ছদ তেমন পছন্দ করেন না ; এই কর্ম্মচারীটিও ছিলেন ঐ রকম স্বভাবের। আশুতোষকে ঘুমাইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার চটি জোড়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুমের ব্যবস্থা করিলেন। এদিকে খানিক পরে ঘুম ভাঙ্গিলে আশুতোষ দেখিলেন তাঁহার চটি নাই। ব্যাপারটা বুঝিতে

তাঁহার একটুও বিলম্ব হইল না। সম্মুখেই সাহেবের কোট একটি হুকে ঝুলিতেছিল। আশুতোষ তখনই সেটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাহেব তাঁহার কোটের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আশুতোষ হাসিয়া জবাব দিলেন—'তোমার কোট আমার জুতা আনিতে গিয়াছে।' সাহেবের অবশ্য আর বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয় নাই।

একবার স্যার আশুতোষ সেনেট সভায় কোন একটা গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময় একজন সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইলেন। সেনেটের এই সভ্যটি স্যার আশুতোষের পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। উহার গলার আওয়াজ পাইবা মাত্র আশুতোষ পিছনে ফিরিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিবাদীর দিকে চাহিলেন, আর প্রতিবাদী অমনি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, কথা বলিবার সাহস আর তাঁহার হইল না। আশুতোষ কাহাকেও ভয় করিতেন না; কিন্তু অনেকে তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত, তাই তিনি "বাঙ্গালার বাঘ" নামে বিখ্যাত।

আশুতোষ তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায়। যেদিন তাঁহার হাইকোর্টে কাজ থাকিত না সেদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েই কাটাইয়া দিতেন। একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে সস্নেহ অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন—'বাড়ীতে আর বিছানাটা রাখিবার দরকার কি? ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া গেলেই ত ভাল হয়!' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার

গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছেন। সেনেটের সভায় তিনি বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'আমি চাই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুই আমার কাম্য নয়।' আশুতোষের এই বাণী-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য চিরকালের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছে।

তিনি ছাত্র জীবনেই গণিতশাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। চর্চ্চা করিলে যে তিনি পরবর্ত্তীকালে গণিতজ্ঞ-দিগের অন্যতম অগ্রণী হইতে পারিতেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একবার তিনি সামান্য বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া আজীবন বিজ্ঞানের সেবায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তখন সে ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এইজন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার মত জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের শাস্ত্রালোচনা ব্যাহত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এদেশে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আরও অনেক টাকা আনিয়া দিতে পারিতেন। দেশের জ্ঞানবিস্তারের জন্য তিনি যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা নির্ভর করে বাঙ্গালীদিগের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার উপর। আশুতোষ আর ইহজগতে নাই; কিন্তু

তাঁহার পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, তাঁহার অবদান সমগ্র বাঙ্গালার সম্পত্তি, তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের ভারও আমাদের সকলের উপর।